

বঙ্গীয় সংস্কৃতি সংস্থা
ক্লাব হাউস, ওয়াশিংটন



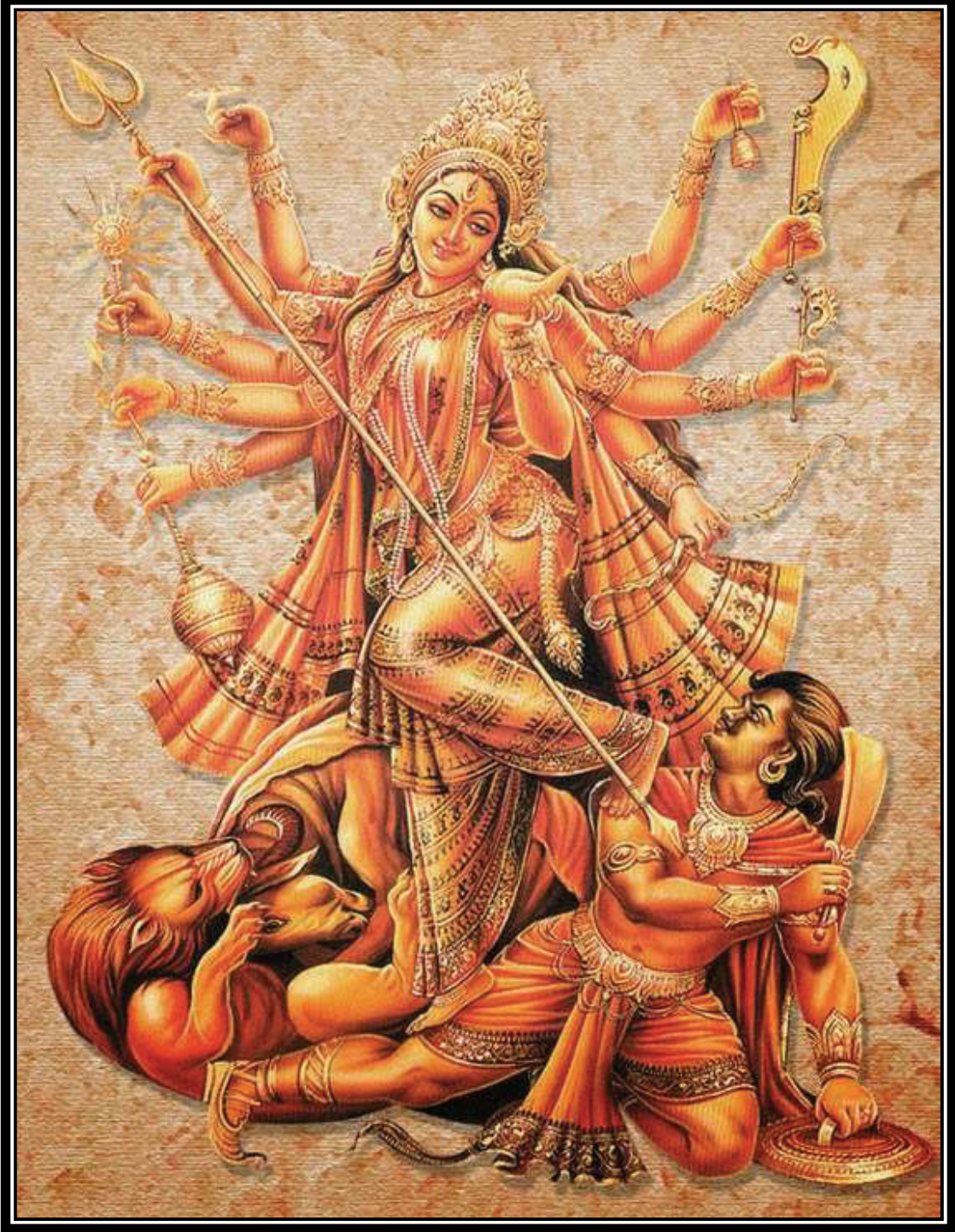
Bengali Cultural Society
Cleveland, Ohio

আ বা হ ন



২০১৮

শরণাগতদীনাতঁ পরিত্রাণপরায়ণে ।
সর্ববস্যাতিহরে দেবী নারায়ণী নমোস্তুতে ॥



শুভা ও ব্রজেশ পাকড়াশী

Best Wishes & Puja Greetings



From.....

Tamali and Soumya Chatterjee

সূচিপত্র

প্রচ্ছদ

সৌমেন ভট্টাচার্য

সম্পাদকীয় • 5

From the President's Desk • 9

Executive Committee 2018 • 13

Puja Schedule/পূজা-নির্ঘণ্ট • 17

BCS EC 2018 Photos • 19

Treasurer's Reports (2017) • 23

Puja Sub-Committee 2018 • 27

গল্প ও বিশেষ রচনা

স্মৃতির দর্পণে • রাজু দাস • 35

বহরমপুর • দিব্যেন্দু ভট্টাচার্য • 41

পথবিভ্রাট • স্বপ্না ব্যানার্জী • 45

The Approval • Taniya Talukdar • 51

সে-নাম রয়ে যাবে • সুজয় দত্ত • 63

The Blue Diamonds Mystery • Rajonya Pramanik • 69

সুরের গুরু • অমিয় ব্যানার্জী • 75

নিবারণের মা • তিতাস মাহমুদ • 85

ফোন • পল্লব ভট্টাচার্য • 103

দুর্গা পূজোর মহালগ্ন • লেখা: সুনন্দা রায়

ছবি: নন্দিনী দেব ও শমীক রায় • 107

শব্দছক

শব্দস্বস্তিকা • অমৃতা নন্দী • 57

শব্দস্বস্তিকা উত্তর • 66

কবিতা

মেঘ বন্ধু • নমিতা দাস • 81

ফেরার পথে • নমিতা দাস • 81

তারপর... • ব্রতী ভট্টাচার্য • 82

মোনালিসা • সুজয় দত্ত • 83

রঙিন কমিক্স

মহিষাসুর • শুভ ব্যানার্জী • 104

রান্নাবান্না

চাল পটল • রুমা বিশ্বাস • 61

অঙ্কন

অনাভি বিশ্বাস • 89

তানভী মালংকার • 89

অনহিতা চৌধুরী • 90

আর্যব মুখার্জী • 90

অহনা দে • 91

অনুষ্কা দে • 91

সুমিত চক্রবর্তী • 92

আঁখি তালুকদার • 93

শৌর্য ভট্টাচার্য • 94

অলিভিয়া নাথ • 95

সারা কুমার • 96

আর্যভ দাস • 96

আরিয়ান ঘোষ • 97

রোহন ঘোষ • 97

ইন্দ্রাণী দাস শর্মা • 98

প্রিয়াশা ঘোষাল • 99

সীমা দাস • 100

অমিতাভ চৌধুরী • 101

**After-School Enrichment Classes
in Math & English**



- Individual Attention
- Small Class Sizes
- Educated Teachers
- Accelerated Learning

Agradeahead
formerly MathWizard

A Grade Ahead of Avon
440.864.7770

অভয়া শক্তি বলপ্রদায়িনী তুমি জাগো



শারদীয়ার হৃদিক শুভেচ্ছাসহ

সুজাতা মিত্র,

সন্ধ্যা, লক্ষীনারায়ণ, দেবলীনা,

সুদেষ্ণা, দেবব্রত ঘোষ



সম্পাদকীয়

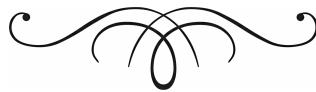
দিগন্তে কাশফুলের মেলা, গাছের তলায় বারে পড়া শিউলি ফুল না থাকলেও, গাছের পরিবর্তিত রঙ, বাতাসের হিমেল ভাব কিন্তু জানিয়ে দেয় যে ক্লিভল্যান্ডেও শরৎ আগত। শারদা মা তাঁর সন্তান-সন্ততি নিয়ে মর্তে এই এসে পড়লেন বলে! আমাদের বাঙালিদের প্রাণের প্রিয় উৎসব দুর্গা পূজায় মেতে ওঠার এই তো সময়!

১৯৭৮ থেকে শুরু হয়ে, নয় নয় করে ৪০ টি বছর পার হয়ে গেল বঙ্গীয় সংস্কৃতি সংস্থা, ক্লিভল্যান্ডের আয়োজিত দুর্গা পূজার। এই বছরে আমরা অত্যন্ত আনন্দিত যে নতুন প্রতিমা কুমারটুলি থেকে ক্লিভল্যান্ডে তার যাত্রা সম্পূর্ণ করেছে। এই উপলক্ষে ১৯শে থেকে ২১শে অক্টোবর আয়োজন করা হয়েছে মাতৃ বন্দনার। শুক্রবারের সন্ধ্যায় বোধন ও ষষ্ঠীপূজা, কচি কাঁচাদের নাচ-গান-বাজনা দিয়ে যে অনুষ্ঠান শুরু; শনিবারে সপ্তমী-অষ্টমী-নবমী পূজা, সন্ধি পূজা, স্থানীয় শিল্পীদের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান হয়ে তা শেষ হবে রবিবারের সিঁদুর খেলা ও বিসর্জন (ঘট) দিয়ে। সঙ্গে অবশ্যই থাকবে উৎসবের মেজাজে আড্ডা, গল্প, ভুরিভোজ।

দেশে, পূজো মানেই আমাদের কাছে আর এক আকর্ষণ পূজাবার্ষিকী পত্রিকা। প্রবাসে থাকলেও পূজোর সেই অন্যতম ফ্লেভারটি আমরা যাতে মিস না করি, তার জন্য প্রতি বছরের মতন এই বছরেও থাকছে বাৎসরিক শারদীয়া পত্রিকা "আবাহন"। এই পত্রিকার সফল প্রকাশের জন্য সংশ্লিষ্ট সকলকে সম্পাদকমন্ডলীর পক্ষ থেকে জানাই অশেষ ধন্যবাদ।

তিনদিন ও চার বেলা ব্যাপী রাজসূয় যজ্ঞের মত এ এক বিপুল আয়োজন! পারিবারিক, সামাজিক ও পেশাগত ব্যস্ততা সামলে এই আনন্দ যজ্ঞকে সাফল্যমন্ডিত করতে বঙ্গীয় সংস্কৃতি সংস্থা, ক্লিভল্যান্ডের সকল সদস্যদের আন্তরিক সহযোগিতা ও পৃষ্ঠপোষকতার জন্য সংস্থার কার্যনির্বাহী সমিতির তরফ থেকে তাঁদেরকে জানাই অসীম কৃতজ্ঞতা। উৎসবের এই দিন গুলি এবং সারা বছর খুব ভালো কাটুক সবার।

শারদীয়া শুভেচ্ছাসহ,
কার্যনির্বাহী সমিতি, ২০১৮
বঙ্গীয় সংস্কৃতি সংস্থা, ক্লিভল্যান্ড, ওহায়ো



BEST WISHES AND BIJOYA GREETINGS



From our Family

Rohit, Mitali, Jayati & Ashis Rakhit

From the President's Desk

Dear members,

It has been a very busy and pleasant road so far. I am truly grateful to everyone who made it possible for me to come this far.

I want to thank everyone who has been continuously supporting our committee from behind the scene besides our active team members.

My heartfelt thanks to Dr. Sadhan Jana for leading the Protima Committee and bringing home our "Maa" from Kumartuli to Cleveland. Congratulations for the job well-done.

I also would like to remember Dr. Bijon Roy, our Bijonda, who had been an active member of this society for a long time. His contributions as a writer appeared in many of our Durga puja publications and his skill in construction with wood surprised many of us when he singlehandedly built the stage for BCS. Above all, his witty conversation and respectful nature will be missed.

My sincere thanks to the executive committee members and their families for their dedication.

Wishing you all a joyous Durgotsav.

Sincerely,

Soumitra K. Ghosh

President, BCS 2018 Exec. Committee



মাতঃ,

“অক্ষজনে দেহো আলো, মৃতজনে দেহো প্রাণ”-

* *



* *

সবাইকে জানাই শারদীয়া শুভেচ্ছা।

উবী,

বৈশাখী ও জ্বর

শারদীয় অভিনন্দন



চ্যাটার্জী পরিবারের পক্ষ থেকে
কালিন (নাতি), পরিতোষ, রেখা, মিমি, ম্যাট, হেতা ও রাজু

মাতৃমন্দির পুন্যঅঙ্গন কর মহোজ্জ্বল...

Seasons Greetings to all our
friends in the community



*Rakesh, Ravi, Rimi,
David, Arjun, Anita, Lily,
Aria, Sipra & Amiya
Banerjee*

শারদীয় অভিনন্দন



জয়দীপ, অম্বালিকা, দিয়াল দাশগুপ্ত,
কোয়েল ও গাভান লকহার্ট

PUJA GREETINGS AND BEST WISHES



From....

Mou, Abhi, Nia, John, Laddu, Anuradha and Niloy Bhadra

Executive Committee 2018

*P*resident

Soumitra K. Ghosh

*V*ice-Presidents

Bharati Majumdar
Indrajit Mukherjee

*S*ecretary

Jayatu Das Sarma

*T*reasurer

Amiya Ghosh

*C*ultural Secretaries

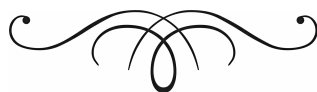
Soumen Bhattacharya
Amrita Nandi
Seema Das

*Y*outh Coordinators

Suranjit Ghosh
Yash Ghosh
Indrani Das Sarma

*T*rustees

Ashoke Banerjee
Bhaswati Bandyopadhyay
Jaharul Haque



Bijoya Greetings and Best Wishes



From.....

*Pratyay, Anuraag, Priya, Pallab, Sanker
and Anima Raman*

আনন্দময়ীর আগমনে সবার
অন্তর আনন্দে ভরে উঠুক



কুমকুম মুখার্জী, আলাপ, সৃষ্টি, শুভশ্রী, প্রবর ও প্রতিমা ঘোষ

शारद शुद्धकामनाय



ब्रह्म, बासवी,
त्रिया ० तानी मेघ

VISION SOURCE

DR. DAVID GALE, OPTOMETRIST

drg@galesvisionsource.com

www.galesvisionsource.com

33541 AURORA ROAD

OLON, OHIO

44139

T: 440-248-2020

M: 216-337-3384

F: 440-248-3425

Puja Schedule/পূজা-নির্ঘণ্ট

Durga Puja

Friday, 19th October, 2018:

- 7:00 PM: Puja
- 7:30 PM: Prasad and Dinner for Kids
- 8:00 PM: Kids' Cultural Program
- 9:30 PM: Dinner for Adults

Saturday, 20th October, 2018:

Morning Schedule

- 10:00 AM: Morning Puja
- 11:30 AM: Pushpanjali
- 12 Noon: Prasad
- 12:30 PM: Lunch for Kids
- 1:00 PM: Lunch for Adults

Evening Schedule

- 6:00 PM: Evening Puja and Arati
- 6:45 PM: Dinner for Kids
- 7:30 PM: Cultural Program by Local Artists
- 9:00 PM: Dinner for Adults

Sunday, 21st October, 2018:

- 10:30 AM: Puja
- 11:30 AM: Pushpanjali and Shantir Jol
- 11:45 AM: Prasad and Dadhikarma
- 12:00 Noon: Lunch for Kids
- 12:15 PM: Baran and Sindur Khela
- 1:30 PM: Lunch for Adults
- 2:30 PM: General Body Meeting
- 3:00 PM: Dhunuchi Naach

Lakshmi Puja

Saturday, 27th October, 2018:

- 6:00 PM: Puja and Panchali
- 7:00 PM: Prasad
- 7:15 PM: Dinner for kids
- 7:30 PM: Cultural Program – Guest Artist
- 9:30 PM: Dinner for adults

দুর্গাপূজা

শুক্রবার ১৯শে অক্টোবর ২০১৮:

- সন্ধ্যা ৭ ঘটিকা : পূজা
- সন্ধ্যা ৭:৩০ ঘটিকা : প্রসাদ বিতরণ ও ছোটদের নৈশ আহার
- সন্ধ্যা ৮ ঘটিকা : ছোটদের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান
- রাত্রি ৯:৩০ ঘটিকা : বড়োদের নৈশ আহার

শনিবার ২০শে অক্টোবর ২০১৮:

প্রাতঃকালীন নির্ঘণ্ট

- সকাল ১০ ঘটিকা: সকালের পূজা
- সকাল ১১:৩০ ঘটিকা: পুষ্পাঞ্জলি
- মধ্যাহ্ন ১২ ঘটিকা: প্রসাদ বিতরণ
- দ্বিপ্রহর ১২:৩০ ঘটিকা: ছোটদের মধ্যাহ্ন ভোজ
- দ্বিপ্রহর ১ ঘটিকা: বড়োদের মধ্যাহ্ন ভোজ

সন্ধ্যাকালীন নির্ঘণ্ট

- সন্ধ্যা ৬ ঘটিকা : সন্ধ্যা পূজা ও আরতি
- সন্ধ্যা ৬:৪৫ ঘটিকা : ছোটদের নৈশ আহার
- সন্ধ্যা ৭:৩০ ঘটিকা : স্থানীয় শিল্পীদের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান
- রাত্রি ৯ ঘটিকা : বড়োদের নৈশ আহার

রবিবার ২১শে অক্টোবর ২০১৮:

- সকাল ১০:৩০ ঘটিকা: পূজা
- সকাল ১১:৩০ ঘটিকা: পুষ্পাঞ্জলি ও শান্তির জল
- সকাল ১১:৪৫ ঘটিকা: প্রসাদ বিতরণ ও দধিকর্মা
- মধ্যাহ্ন ১২ ঘটিকা: ছোটদের মধ্যাহ্ন ভোজ
- দ্বিপ্রহর ১২:১৫ ঘটিকা: বরণ ও সিঁদুরখেলা
- দ্বিপ্রহর ১:৩০ ঘটিকা: বড়োদের মধ্যাহ্ন ভোজ
- দ্বিপ্রহর ২:৩০ ঘটিকা: জেনারেল বডি মিটিং
- দ্বিপ্রহর ৩:০০ ঘটিকা: ধুনুচি নৃত্য

লক্ষীপূজা

শনিবার ২৭শে অক্টোবর ২০১৮:

- সন্ধ্যা ৬ ঘটিকা : পূজা ও পাঁচালি
- সন্ধ্যা ৭ ঘটিকা : প্রসাদ
- সন্ধ্যা ৭:১৫ ঘটিকা : ছোটদের নৈশ আহার
- সন্ধ্যা ৭:৩০ ঘটিকা : সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান – অতিথি শিল্পী
- রাত্রি ৯:৩০ ঘটিকা : বড়োদের নৈশ আহার

BCS EC 2018 Photos





Bijoya Greetings and Warm Wishes to all

Dr. Atul & Shuva Mehta

50 Stonewood Drive, Moreland Hills, Ohio 44022



WITH BEST WISHES AND PUJA GREETINGS



*Amit, Arindam,
Sharmila and Jyoti Chakraverty*



*Renal Consultants Inc. of Canton
Wishes each and everyone a
Happy Durga and Laxmi Puja*



*Dr. A. Maitra Dr. A. Kontamwar Dr. N. Pradhan
Specialists in Kidney Diseases and Hypertension*

শারদীয় অভিনন্দন



*Sib, Laxmi, Arup Mallik; Anita,
David & Oliver Shilling*



সৌম্যজিৎ মন্ডল, অভিনন্দা মুখার্জী

ও

আনন্দ মন্ডল

Puja Sub-Committee 2018

Priests:

Brojesh Pakrashi (*Convener*)
Smarajit Bandyopadhyay
Kaushik Ghoshal

Puja Preparation:

Anuradha Bhadra (*Convener*)
Shyamasree Datta
Ambalika Das Gupta

New Protima Committee:

Sadhan Jana (*Convener*)
Ashoke Banerjee
Rabisankar Talukdar

Protima Transportation:

Indrajit Mukherjee (*Convener*)
Barsanjit Mazumder
Utpal Datta
Ranjan Dutta
Jayatu Das Sarma
Sujit Sarkar
Soumyajit Pal
Ananya Biswas
Kingshuk Das
Amiya Ghosh
Jaydip Das Gupta

Puja Mandap Decoration:

Seema Das (*Convener*)
Rabisankar Talukdar
Rupak Deb
Ananya Biswas
Dolon Talukdar
Kingshuk Das

Bhog:

Sumitra Bhattacharyya
(*Convener*)
Manjushree Banerjee
Mukta Ghosh

Puja Prasad:

Sudeshna Mitra (*Convener*)
Bharati Majumdar (*Convener*)
Soma Jana
Ruma Biswas
Swapna Banerjee
Nilanjana Mazumdar
Subhashri Ghosh
Mahua Das Sarma
Rajlakshmi Ghosh
Brati Bhattacharya

Dadhi Karma:

Bharati Majumdar (*Convener*)
Manjushree Banerjee
Rajlakshmi Ghosh

Food committee:

Mukta Ghosh (*Convener*)
Bharati Majumdar
Brati Bhattacharya
Ananya Biswas
Rajlakshmi Ghosh
Nilanjana Mazumdar
Amiya Ghosh
Indrajit Mukherjee

Kitchen Management:

Baikuntha Saha (*Convener*)
Jaharul Haque (*Convener*)
Utpal Datta
Ramen Majumdar
Paritosh Chatterjee

Niloy Bhadra
Prabar Ghosh
Ranjan Dutta
Jaydip Das Gupta
Ananya Biswas

Fundraising and

Advertisement:

Soumitra Ghosh (*Convener*)
Amiya Ghosh (*Convener*)
Rajlakshmi Ghosh
Ramen Majumdar
Mitali Das Singh
Bharati Majumdar
Soumen Bhattacharya
Jayatu Das Sarma
Amrita Nandi
Prabar Ghosh
Utpal Datta
Suparna Mazumdar

Brochure and Design:

Soumen Bhattacharya
(*Convener, Cover Design, Artworks*)
Amrita Nandi (*Editor*)
Amitava Chowdhury
Amiya Ghosh
Indrajit Mukherjee

Shopping:

Soumitra Ghosh
Utpal Datta
Jaydip Das Gupta
Jayatu Das Sarma
Rajlakshmi Ghosh
Amiya Ghosh
Mukta Ghosh

শারদীয়ার প্ৰীতি ও শুভেচ্ছা



বিসা, অঞ্জলি, অরুপ , ক্ৰমা, অমিত

BIJOYA GREETINGS



From
Ramen, Bharati, Neal and Ronit Majumdar

Cultural Program:

Seema Das (*Convener*)
Amrita Nandi (*Convener*)
Soumen Bhattacharya
(*Convener*)
Brati Bhattacharya
Lopamudra Das
Monali Mazumdar
Yash Ghosh (*Youth
Coordinator*)
Indrani Das Sarma (*Youth
Coordinator*)

Youth Volunteer:

Yash Ghosh (*Youth
Coordinator*)
Indrani Das Sarma (*Youth
Coordinator*)
Suranjit Ghosh (*Youth
Coordinator*)
Adrik Datta
Siddhant Sarkar

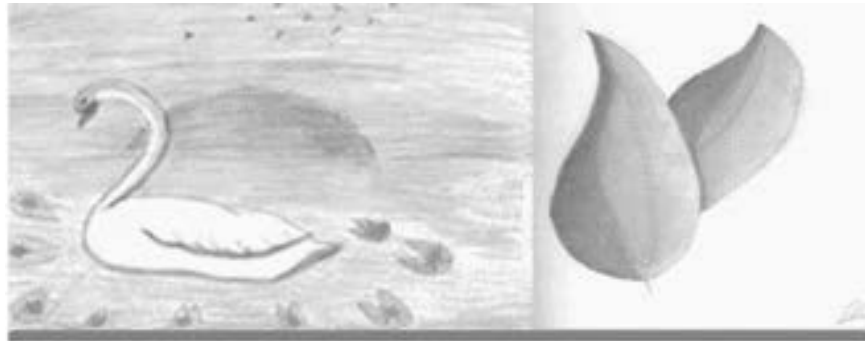
Light and Sound:

Soumen Bhattacharya
Ranjan Dutta

Web and Social Media:

Kingshuk Das (*Convener*)
Indrajit Mukherjee
Amitava Chowdhury
Soumen Bhattacharya





शान्ति - अहमि



Phone 330-773-1551
Fax 330-773-9211



Adam Klein Seafood

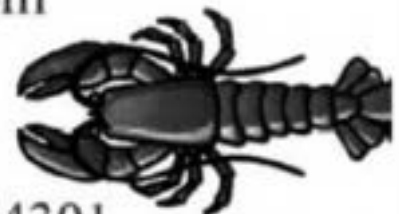
Daily Fresh & Frozen Seafood

Hour: Daily 9am ~ 6pm

Sundays 10am ~ 1pm



Curt Klein



1072 Grant St., Akron OH 44301

Bijaya Greetings



*Ashoke, Swapna, Arnab & Katherine,
Debraj Banerjee*

Best Wishes and Puja Greetings



*Asoke, Madhumita,
Anushka and Ahana Dey*

স্মৃতির দর্পণে

রাজু দাস

ব্রুকস্পের কিভারগাটেন স্কুলের অভিভাবকদের বিশ্রাম ঘরে আমরা কয়েকজন বসে দেখছি বাচ্চাদের, অদ্ভুত কাঁচের দেওয়াল ভেদ করে। ওরা কিন্তু আমাদের দেখতে পাচ্ছে না। একদিকে কম্পিউটারে কাজ করার ফাঁকে ফাঁকে প্রিন্সিপাল মিসেস ক্যাথরিন শিশুদের দেখছেন। কখনো অভিভাবকদের সাথে কথা বলছেন।

অনাভি, আমাদের নাতনি অন্যদের সাথে বিশাল ডাইনিং টেবিলে খেতে বসেছে। স্কুল থেকেই খাবার দিয়েছে। খাবার আগে লিকুইড সোপে বেসিনে হাত ধুয়ে নিয়েছে সবাই, যদি কেউ কাঁটা চামচে না খায় তাই।

একটু পরে টাইট প্যান্ট সাদা গেঞ্জি গায়ে ত্রিশোর্ধ্ব মধ্যবর্ণা রোগাটে মেয়ে কালোচশমা খুলে অধ্যক্ষার সাথে ফটোফট ইংরাজীতে কিছু কথা বললো। আমি চেয়ারটা ছেড়ে পাশের চেয়ারটাতে বসে আমার ভার্যার সাথে বিশেষ একটা প্রসঙ্গে কথা বলছিলাম। একটু পরে উক্ত মেয়েটি শব্দহীন মিষ্টি হেসে স্পষ্ট ঢাকাইয়া শহুরে বাঙালিভাষায় বললেন --আপনেনগো কতা হইনাই বুঝতে পারছি, আপনেরা বাঙালি। তাছাড়া হিতায়, কপালে হিন্দুর সিন্দুর, পরণে হাড়ি দেইখ্যাই ঠাহর করসি। তা কইখন আইচেন? বাঙলাদেশ না ইন্ডিয়া খন?

নমিতা বললে --কইলকাতা, দমদম বিমানবন্দরের সামনে আমাগো বাসা। আপনি কবে কোনহান থাইক্যা আইচেন?

ঢাকার শাখরিপট্টর বোগলেই আমাগো বাসা। এক বইন আর আম্মু থাকেন ওইহানে। আমার বড়ভাই পেখম নিউইয়র্কে আহেন পেরায় চল্লিশ বছর আগে। কোনও এক রেস্টোরাণ্টের রান্নানী হইয়া যাত্রা হুরু কইগ্যা বড়ভাই এহন পেপ্লাই হোটেলের মালিকা দুইশোর ওপর স্টাফ। হেই আমাগো এগারোজন ভাই বইনরে এই আমেরিকায় লইয়া আইচেন। আম্মু বাঙলাদ্যাশের খাওন দাওন ছাইড়া অন্য কোনহানে থাকতে রাজি না। হ্যার কতা জন্মাইচি এই বাঙলাদ্যাশে, মরুম এই দ্যাশে। আম্মুর লাইগ্যাইতো ছোড বইনডা রইচে ঢাকায়।

আমি অবাক না হয়ে বললাম --কয় ভাই বইন আপনেরা?

--চাইর বইন সাতভাই। ভাইরা হরুগেই এইদ্যাশে হোটলেই কাম করতাছে। আমরা তিনডা বইন নেহাপড়া শিইখ্যা চাকরি করতাছি।

--হরুগেই কি নিউইয়র্কে একই বাসায় থাহেন?

না না, আলাদা আলাদা বাড়িতে থাহে। একমাত্র ঈদের তিনদিন হরুগেই বড়ভাইয়ের বাসায় মিলিত হই, নামাজ পড়া ভালো ভালো খাওন দাওন হয়।

--আপনে অতোবড় শহর ছাইড়া এই ছোট্ট শহরে থাকেন ক্যান?

--আমার খসমের মানে সোয়ামির লাইগ্যা।

--আপনের স্বামী কি এই ব্রুকস্পে চাকরি করেন?

--না। ফুড প্রসেসিং লইয়া এই সাউথ ডাকোটা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়তাছে। অন্যহানে চান্স পায়নাই তো, তাই।

--আপনে কি ঘর কইন্যা সামলান?

--হেইডার ইচ্ছা থাকলেও উপায় নাই।

নমিতা বললে --উপায় নাই ক্যান?

--বারে! ভাতারের খাওন দাওন, পড়ার খরচ জোগাইতে হইবো না? তাই ইন্ডিয়ান গোছারিতে সেলসের জব করি। রান্নাবান্না করি, পোলা মাইয়া হামলাই।

--ব্রুকস্পে ইন্ডিয়ান গোছারি আছে নাকি, আগেরবার আইস্যাতো দেখি নাই?

--এই কয়েক মাস আগে ডাউনটাউনে হইচে। জানেন আমেরিকার যত হোটেল মোটেল রেস্টোরাণ্ট দেখবেন তার অধিকাংশের মালিক পাকিস্তানি নয়তো পাঞ্জাবী। কর্মচারী বাঙালি।

--আপনের বড়ভাইয়ের হোটলে তাইলে সবাই বাঙলাদেশি, কি কন?

--তা হাচা কতাই কইচেন। জানেন বাঙলাদ্যাশে যার তিনখান পোলা আছে, হ্যাগো মইধ্যে দুইজনরে জমিজমা বেইচ্যাও বিদ্যাশে পাঠাইবোই। কি করবো হেরা বাঙলাদেশে তো চাকরি বাকরি নাই।

--পশ্চিমবঙ্গেও পোলাপানগো বিদেশে পাঠানোর ঝাঁক শুরু হইছে। আইচ্ছা, যারা টুরিস্ট ভিসায় আসে, হেরা তো ছয় মাসের বেশী থাকতে পারে না, তাইলে বছরের পর বছর এদেশে থাকে ক্যামনে?

--হে অনেক কায়দা কানুন আচে তা আপনেগো জাননের কাম নাই তয় ইন্ডিয়ায় যেমনে থাকে তেমনি এইহানেও থাকে।

--শুনছেন হয়তো ২০০৩ সালে বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারীদের তাড়ানোর আইন চালু করেছেন ভারত সরকার। শুনতে পাই এ দ্যাশে নাকি অনুপ্রবেশকারী বাঙালিদের অঙ্কেক টাকায় কাম করায়?

--আপনের কতায় কিছুটা সত্যতা আছে।

নমিতা এতক্ষণ আমাদের দুজনের কথার মাঝে ঢোকান সুযোগ পাচ্ছিল না তাই উসখুশ করছিল। ভদ্রমহিলার 'ভাতার' শব্দটাতে ও কেমন যেন তচ্ছিল্যের ভাব অনুভব করেছিল তাই জিজ্ঞাসা করলো --আপনার কি ভাব ভালবাসার বিয়া হইছিল?

এবার স্বলজ্জ হেসে বললে মেয়েটি --তা কইতে পারেন। ও হিন্দু গরিবের পোলা। বাঙলাদ্যাশে এম.এস.সি পাশ কইরা বেকার আছিল। আমাগো গেরামের বাসার পাশেই ওগো বাড়ি। ছোডবেলা খন আমাগো লগে খাতির।

আমি তো গ্যাঢাকাল খন গেরামে নানা নানির কাছেই থাকতাম। দুইজনে একই পাঠশালা, হাইস্কুলে পড়ি। ম্যাট্রিক পাশ করণের পরে বড়ভাই আমারে নিউইয়র্কে নিয়া আইচে। পরে নিজের পায়ৈ দাঁড়াইয়া অরে লইয়া আইচি। ঐ দ্যাশে থাকলে তো হিন্দুর পোলারে বিয়া করতে পারতাম না। মোল্লারা ছেমড়াডারে কাইট্টা ফলাইতো।

--তা সত্যি কথাই বলেছেন। আমাগো কোলকাতা শহরে হিন্দুর মাইয়া প্রিয়াঙ্কা, মুছলমানের পোলা রিজানুরের বিয়া হওনের পরে প্রিয়াঙ্কার বাপে সুপারি-কিলার দিয়া রিজানুরের মার্ডার করাইলো অথচ দ্যাহেন শর্মিলা ঠাকুর পতোদি কে বিয়ে করেছে। কবির সুমন থেকে কতজনই মুসলমানের মেয়েকে বিয়ে করেছে। সে বেলায় কোন প্রতিবাদ হয়নি যেহেতু তারা সবাই অর্থবান এলিট।

--আমি খবরটা টিভিতে দেখেছি। কবে যে মানুষের মন থেকে হিন্দু মুছলমানের ভেদাভেদ, বিদ্বেষ দূর হবে জানি না।

নমিতা বললে --আপনার সোয়ামি ঘরের কাম কাজে আপনারে সাহায্য করে?

--কইরলে তো খুশীই হইতাম। হাচাকতা কি জানেন, আমাগো মুছলমান পুরুষগুলান চেরডাকাল মেয়ামাইনযের ওপর চোটপাটই কইরা থাকে। হেগো ধারণা মেয়ামানুষরা হেগো দাসি বান্দী। পোলা বিয়াইন্যা যন্তুর। হ্যাগো চালচলন দেইখা আমার পিরীতের সোয়ামীডাও তাই করে।

নমিতা একটুখানি হেসে আমার দিকে তাকিয়ে বললে --এ বিষয়ে হিন্দুদের স্বামীরাও সমান পারদর্শী, কি বলো দাসবাবু?

আমি কৃত্রিম রাগতন্ত্রের বললাম --তুমি আমাকেও ঐসব পুরুষ দের দলে ফেলো না। আমি তোমার দাসানুদাস গোবেচারা পুরুষ।

মেয়েটি বললে --আমি এদেশে বসবাসরত হিন্দু পরিবারে বেড়াইতে গিয়া দেখচি হ্যারা স্বামী স্ত্রী একলগে সংসারের কামকাইজ করে। সীমা-অনন্য, শোভন-গীতাদিকেও দেখেছি।

--আপনি তসলিমা নাসরিনের ল্যাখা বইগুলান পড়ছেন?

--হক্কলগুলাই পড়ছি। ওনার বই পইড়া মনে হয় আমি যদি অমন প্রতিবাদী লেখা লিখতে পারতাম।

--পাকিস্তানের মালালাকে জানেন?

--টিভিতে দেখেছি যে ১৬ বছর বয়সে মুছলিম মেয়েদের শিক্ষার দাবিতে সোচ্চার হইচে, মরণের ভয়কে জয় করে।

--আপনে বাঙলার প্রথম মুসলিম নারী শিক্ষিকার নাম জানেন?

--রোকেয়া সাখাওয়াত।

--১৮৪৬-১৮৮৫ সালের কোন এক সময়ে পুনে শহরে প্রথম অচ্ছুৎ শিক্ষিকা সাবিত্রীবাই ফুলের সঙ্গে শিক্ষিকার দায়িত্ব পালন করেছিলেন ফতিমা বেগম। এর পরবর্তী সময়ে মুসলমান মেয়েদের মধ্যে শিক্ষা প্রসারে রোকেয়ার নাম চিরস্মরণীয়।

নমিতা বললে --বাঙলাদেশে যান না?

--যাই তো, তয় দুই চাইর বছর পরো। বাঙলা ভাষা দিবস উপলক্ষে। শহীদবেদিতে মাল্যদান কইরতে এবং আমার সোনার বাঙলা আমি তোমায় ভালোবাসি, জাতীয় সঙ্গীতের সাথে গলা মিলাইতো।

--ঢাকার বাসায় থাকেন তো?

--না, ঢাকা শহরের ট্রাফিক জ্যাম ভালো লাগে না। সারা পৃথিবীর অন্য কোথাও এতো রিকশা আছে কি না সন্দেহ! আমি যে ক'দিন থাকি, গেরামের বাড়িতেই থাকি। টাটকা চুনোপুঁটি, টাকি, খইলসা, কই, ইচা, কাগজি, ফলই, মোরলা, টেংরা মাছ খাই। উনুনের পাশে বইসা বাসি বেনুন দিয়া চিতইপিঠা খাই। এক বাঁক পাতিকাক, শালিক, চড়ুই পাখিরা আইসা ভিড় করে। বিলাইতে হেগো খোচাইয়া দেয়, তবুও আমি চিতইপিঠা ছয় সাতখান ছিইড্যা ছিইড্যা ছিটাইয়া দেই। আমার ছোড পোলা মাইয়াডা অগো ধরণের জন্যে ছুটাছুটি করে। এসব দেখতে কি যে ভালো লাগে আমরা। হক্কলের চাইতে ভালো লাগে ভোরে সূর্য ওঠার আগে মোরগের ডাকে যখন ঘুম ভাঙে। কুঞ্জদাস বৈরাগীর আখড়ার প্রভাতী কীর্তনের সুর। পল্লীবালার ধান সিদ্ধের আত্মাণ, নদীতে খ্যাপলাজাল ফেলার শব্দ। নৌকোর বৈঠা বাইবার শব্দের সাথে মাঝিভাইয়ের ভাটিয়ালি সুরের গান। পাখিদের গুঞ্জনা আরো আরো শব্দ ও দৃশ্যের মেলবন্ধন আমার তৃষিত মন ও কর্ণকে সজীব কইরা তোলে। তখন আর ইচ্ছা করে না কাঠ পাথরের তৈরী আমেরিকা ফিইরা যাইতে।

আমি অবাক বিস্ময়ে তাকিয়েছিলাম আমার বাঙলামায়ের খাঁটি বাঙালি মেয়েটির চোখের দিকে। নমিতা ও আমি দুজনেই তো ঐ আকর্ষণে বছরে অন্তত একবার মাসখানেকের জন্যে যেতে চাই আমাদের বাঙলাদেশের জন্মভিটাকে প্রনাম করতে। সেখানের ধূলিকনাকে সারা শরীরে মাখতে। যে মাটিতে আমাদের শৈশব কৈশোরের অনেক ক'টি বছর কেটেছিল। সেই মাটিকে স্পর্শ করে মনে মনে বলতে চাই, মাগো যতই আমরা ভারতের নাগরিকত্ব গ্রহণ করি না কেন, আমাদের শিকড় যে এখানেই। এই গ্রাম্যমাটিতেই আমাদের বাপ, মায়ের, ঠাকুরদা ঠাকুমার জন্ম হয়েছিল।

নমিতা বিষণ্ণতার আবহ কাটিয়ে বললে --বাঙলাদেশে পদ্মার ইলিশ মাছ খান নাই?

--না, হেই পদ্মার ইলিশমাছ যে কয়খান জালে ওঠে হক্কলগুলাই বিদাশে রপ্তানি হয়।

--ঠিকই কইছেন। আমার বড় জামাই অনন্য দূর্গাপুজোর সময় মিনিয়াপোলিস খন দুই কিলো ওজনের দুইখান পদ্মার ইলিশ কিইনা আনছিল।

আমি বললাম --ম্যাঞ্চেস্টারে আমার ছোড জামাইও দুইখান দুই কেজি ওজনের ইলিশ কিইনা আনছিল। আ হা জব্বর স্বাদ।

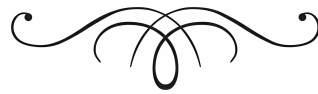
নমিতা উৎসাহিত কঠে বললে --শোনে বইনডি একখান মজার কতা কই --ম্যাঞ্চেস্টারে বাঙলাদেশের টেলিভিশনের একখান বিজ্ঞাপন আমাদের খুব ভালো লাগতো।

--কি আছিল হেতায়?

--একজন জেলেভাই জালে পনরো-কুড়ি কেজি একখান কাতলামাছ ধইরা ডাঙায় তুলেছে, এমন সময় চেয়ারম্যান সাহেব কইলেন --এই জাইলা, মাছখান কইটা আমার বাসায় দিয়া যাইস। জাইলাভাই চিক্কুর কইরা কইলো --এইমাছ খাইতে হইলে ইন্টারনেশনাল পাসপোর্ট লাগবো। চেয়ারম্যান কইলেন --হারামখোর এই কতা কইলি ক্যান?

মাঝিভাই বললেন --আরে মিঞাসাহেব, এই সাইজের যেকোন মাছ খাইতে হইলে লন্ডনের হালাল মাছ মাংসের দোকানে যাইতে হইবে।

মেয়েটি শব্দ করে হেসে বললে --মেলাদিন বাদে আপনাগো লগে মন খুইলা কতা কইয়া খুব আনন্দ পাইলাম। চলেন যাই পোলাপানরা স্কুল গার্ডেনে গ্যাছে খেলা ধূলা করতে, আমরাও যাই।





Bijoya Greetings

From

Suman, Soma & Sumeet

শারদ মঙ্গলাসন



উৎপল, অ্যান্থনী ও উষসী দত্ত

*Best Wishes and Puja
Greetings*



*From:
The Kundu Family*

RUMI'S
Market & Deli

8225 Carnegie Ave., Cleveland, OH 44103
216-229-7864

Conveniently located in proximity to Cleveland Clinic, Case Western University and Cleveland State University, Cleveland Heights and Downtown Cleveland

**Low-Price, High-Quality
all Indian Groceries
vegetables and more...**



At Rumi's Market, we carry a wide selection of Indian-Pakistani groceries with ethnic produce and fresh meats at affordable prices.

Also, spacious restaurant serving delicious ethnic food

Plenty of free parking space



বহরমপুর

দিব্যেন্দু ভট্টাচার্য্য

শহর বহরমপুর, জেলা মুর্শিদাবাদ।
সেদিনটা ছিল বুধবার। বাইশে আষাঢ়।
দাদুর ঘরের mosaic করা মেঝে।

প্রসব ক্লান্তিতে অবসন্ন আমার বিধবা মায়ের বুকের ওপর যখন দাই এসে আমাকে রেখে গেল তখন প্রায় বেলা আড়াইটে। শুনছি মা'র মুখে একটা তৃপ্তির রেখা ফুটে উঠেছিল। মা'র মুখে সব সময় একটা পাতলা হাসি লেগে থাকতো। ইস্কুলে ওঠার পর বাংলার ক্লাসে 'স্মিত আস্য' কথাটা জানার পর মনে হয়েছিল আমার মা'র জন্যই কথাটা তৈরী হয়েছে।

সেই থেকেই চলা শুরু। হামাগুড়ির পালা শেষ হওয়ার পর ডান্ডাগুল্লি, টিপ্পি, এক্সা-দোক্কা, গঙ্গার ধার, শূশান ঘাট, গঙ্গার চড়ার ওপরে পটলের ক্ষেত, ঠাকুর বাড়ি, নগর কীর্তন, হীরা, কমল, পল্টন, নন্দ, পচন বাবু, কাবলি বাবু, square field, district judge-district magistrate-civil surgeon দেব বাড়ি, ছোড়িভাইয়ের কলেজ পেরিয়ে আমার ইস্কুল, ইস্কুল যাওয়ার পথে টিল ছুঁড়ে আম পাড়া জীবনের পাতা ক্রমশই উল্টে-উল্টে যায়।

বহরমপুর আর কিছুতেই আমাকে ছাড়ে না। এখনও রাতে শোওয়ার পর গঙ্গার ধার দিয়ে হাঁটতে-হাঁটতে ঘুমের দেশে চলে যাই। বহরমপুরকে ভুলতেও পারিনা, অথচ বিক্ষিপ্ত চিন্তা গুলোকে গুছিয়ে এক জায়গায় জড়ো করতেও পারিনা যে কারো সঙ্গে share করবো বা নিজের কাছেও পরিষ্কার হবে। এই ভাবেই চলছিল। হঠাৎ বহরমপুর ইস্কুলের এক পুত্র সম বন্ধু আমাকে চিন্তা যুগিয়ে দিল। বুঝলাম যে এই মাধ্যাকর্ষণটা শুধু আমাকেই নয়, অনেককেই একই ভাবে টানে।

সত্যিটা হলো যে:

আমার স্ববির অতীত আমায় টানে।
আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে ফেলতে চায়
আমার সমস্ত সন্তাকে।
পুরোনো সব ছায়া ও ছবিতে
মারো মারেই ঝাপসা হয়ে ওঠে দৃষ্টিটা।

সেই চেনা নদীর পার,
সেই কৃষ্ণচূড়ার ছায়া,
যেখানে কেটেছে অনেক অলস দুপুর,
তারা সকলে আমাকে টানে।

সেই যে মধ্যরাত্রির নির্জন পথ
যে কিনা আমার সমস্ত রাত জাগা উন্মত্ততা
আর উন্মাদনার সাক্ষী,
তারও টান অনুভব করি প্রায়ই।

আমাকে টানে আমার শহর,
শহরের সেই চেনা রাস্তা-
যে ছিল আমার ঠিকানা বিহীন
পথ চলার সঙ্গী।

এই টান আমায় কিছুতেই রেহাই দেয় না।
এক মন খারাপের দোলা যেন কষ্ট রোধ করতে আসে।
আমার আর কিছুই করার থাকে না।

আমার স্ববির অতীত আমায় টানে।

এই ভাবেই অনুভূতি আর চিন্তাকে সমান্তরাল করে রেখেছিলাম কিছুদিন ধরে।
তা হোক না। অসুবিধাটা কি? কিসের বাধা?
কিছুদিন পরে মনে হলো এই মানসিকতার হাতে বন্দী হলে তো পৃথিবীর চলমান গতি থমকে যাবে। হয়তো বা আটকেও যেতে পারে।

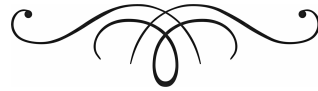
আসল সত্যিটা হলো যে:

আছে স্ববিরতা, আছে রুক্ষতা।
আছে পাতা ঝরার দিন।

ডুবন্ত সূর্যের সোহাগ মাখা চাঁউনিতে
আজও খেলা করে অস্তিত্বের সংকট।
তবু কোথা থেকে যেন উড়ে-উড়ে এসে
হাতের মুঠোয় জমতে থাকে রঙ।
তাই আমরাও এত উদাম, বন্ধনহীন।
সে তো ঐ স্ববিরতার জন্যই।

কান্না বন্ধনহীন হলে তবেই তো হাসি হয়ে ওঠে লাগাম ছাড়া।

রাঙিয়ে তুলতে হবে জীবনটাকে।
অনেক রঙ অপেক্ষা করছে।
তাদের খুঁজে নিতে হবে,
বেছে নিতে হবে,
নিজের মতো করে।



ଆସନ୍ତାଙ୍କୁ ଅନନ୍ଦିନୀ



ଅନନ୍ଦିନୀ, ଶୁଭ, ଶ୍ରୀ, ଶୌର୍ଯ୍ୟ

পথবিভ্রাট

স্বপ্না ব্যানার্জী

অল্প কিছুদিন আগে এক শনিবারের সন্ধ্যায় জটনৈক বন্ধুর বাড়ীতে জমিয়ে আড্ডার আসরে বসেছিলাম। আলোচনার বিষয়বস্তু সেই মুহূর্তে ছিল সকলের এদেশে গাড়ী চালানোর অভিজ্ঞতা সম্বন্ধে। ভদ্রলোকেরা যথারীতি তাঁদের গৃহিণীদের চালানো নিয়ে নানারকমের রসালো মন্তব্য করছিলেন। উত্তরে মহিলারা অভিযোগ জানাচ্ছিলেন যে তাঁদের চালানোয় গোড়ার দিকে যে সব সমস্যা হয়েছিল তার প্রধান কারণ তাঁদের স্বামীদের শেখানোর অক্ষমতা। যখন আমার পালা এল তখন আমাকে স্বীকার করতে হল যে এ ব্যাপারে অন্তত আমি আমার পতিদেবকে দোষ দিতে পারব না, কেননা এই শেখানোর দায়িত্বটা তাঁর ছিল না। সেটা আমার বাবা আমার বিয়ের আগেই পালন করে রেখেছিলেন। তবে এর মানে এই নয় যে আমারও সেই অভিজ্ঞতাটা খুব সুখকর হয়েছিল।

আমার বাবা মেয়েদের শিক্ষার ব্যাপারে খুবই প্রগতিশীল ছিলেন। বাবার মতে মেয়েরা করতে পারে না এমন কিছুই নেই। শুনেছি নিজের বিয়ের পর বাবা যখন আমার সতেরো আঠারো বছরের মাকে ঢাকা থেকে পুণাতে নিজের কাছে নিয়ে এসেছিলেন, তখন প্রথমেই মাকে একটা সাইকেল কিনে দিয়েছিলেন। আমার দিদির জন্মের পর বাবা নিজের হাতে কাঠ দিয়ে একটা ছোট্ট babyseat তৈরী করেছিলেন সাইকেলের জন্য যাতে আমার মা শিশুকন্যাকে তার ওপর বসিয়ে ঘুরতে পারেন। এর কিছু বছর পরে বাবার যখন গাড়ী হল তখন বাবা মাকে সঙ্গে সঙ্গে গাড়ী চালানো শিখিয়ে দেন। ছোটবেলায় বিলাসপুরে থাকাকালীন সেটা আমাদের কাছে খুবই স্বাভাবিক ব্যাপার বলে মনে হত। আমরা কলকাতায় আসার পর অবশ্য মা লোকলজ্জার ভয়ে আর কখনও গাড়ী চালান নি। এহেন বাবা যে আমার চোদ্দ বছর বয়সে গরমের ছুটিতে বাড়ীর সামনের খোলা মাঠে আমাকে গাড়ী চালানো শেখাতে ঠিক করবেন তাতে আর আশ্চর্য্য কি? কলকাতায় ততদিনে অনেক না হলেও কিছু কিছু মেয়েরা গাড়ী চালাতে শুরু করেছেন। তবে মুশকিল হল যে আমার বাবা খুব রাগী মানুষ ছিলেন এবং শিক্ষক হিসেবে তাঁর ধৈর্যের খুবই অভাব ছিল। ফলে সেই গরমের ছুটিটা আমার খুব ভাল কাটে নি। দুঃস্বপ্নের মত এখনও মনে পড়ে খোলা মাঠে ঘাস খেতে ব্যস্ত কিছু নিরীহ গরুকে ভয় পাইয়ে দিয়ে আমাদের সেই পুরোনো Ford গাড়ী গর্জন করে এঁকেবেঁকে ছুটছে এবং মাঝে মাঝে gear বদলের ধাক্কায় থরথর করে উঠতেই বাবার বকুনিতে কান ফেটে যাচ্ছে। বলাই বাহুল্য, শিখতে খুব বেশী সময় লাগে নি। একেই বলে গজাল দিয়ে মাথায় ঢোকানো।

এদেশে আসার পর আমার কর্তার দায় হয়েছিল আমাকে রাস্তা চেনানো। এ ব্যাপারে আমি আবার আমার দাদা ও দিদির একেবারে উল্টো – মায়ের genes পেয়েছি। দিকজ্ঞান জিনিষটা আমার কোনও দিনই রপ্ত হয় নি। দেশে কখনও একা বা দূরে কোথাও চালাই নি তাই এটার দরকার হয় নি। তাছাড়া দেশে কেউ কখনও এদেশের মত রাস্তার উত্তর, দক্ষিণ, পূর্ব, পশ্চিম এসব নিয়ে মাথা ঘামায় না। বাঁয়ে, ডাইনে, আর সোজা বুঝলেই চলে। এদেশে জীবনের বেশীর ভাগ কাটিয়েও আমার এ ব্যাপারে জ্ঞানবৃদ্ধি তেমন হয় নি। এককালে নানা প্রয়োজনে বহু গাড়ী চালাতে হত, তখন তো আর GPS ছিল না। Map পড়তে হিমশিম খেয়ে যেতাম। দূরে কোথাও যেতে হলে কর্তা একটা কাগজে বড় বড় করে ডাইনে বাঁয়ে করে রাস্তার বর্ণনা লিখে দিতেন। উল্টো দিকে ফেরার directions থাকত। পই পই করে বলে দিতেন যে যাবার সময় রাস্তায় যেখানে ডাইনে ঘুরবে, সেটা কিন্তু ফেরার সময় বাঁয়ে ঘুরতে হবে। যদিও সবরকম নতুন gadget কেনার ব্যাপারে আমরা আর সব ভারতীয় বন্ধুদের থেকে দুতিন বছর পেছিয়ে থাকতাম, car phone যখন বেরোলো, তখন বন্ধুবান্ধবদের মধ্যে আমার গাড়ীতেই প্রথম সেই বিরাট size এর যন্ত্রটি লাগানো হল। সেই ফোনের মাধ্যমেই আমার কর্তা বছবার তাঁর পথহারা বৌকে ঘরে ফিরিয়ে এনেছেন। আমার এই পথবিভ্রাটের ছোটখাট গল্প বলে আমি প্রায়ই আমার বন্ধুদের কৌতুকের উদ্বেক করে থাকি। সেদিনের আড্ডায় আমাকে কয়েকজন ধরে বসল এই নিয়ে একটা হাসির গল্প লিখতে। শুনেই আমি ভয় পেয়ে গেলাম। মাঝে মধ্যে তথ্যভিত্তিক কিছু রসবিহীন ভ্রমণকাহিনী লিখেছি, কিন্তু হাসির গল্প? হাত পা নেড়ে নাটকীয় ভাবে গল্প বলে লোককে হাসানো সোজা, কিন্তু সেই ছোটবেলায় পড়া শিবরাম চক্রবর্তীর মত হাসির গল্প লিখতে অনেক প্রতিভা লাগে, যা কিনা আমার অবশ্যই নেই। তাই শুনে একজন বলল “হাসির গল্প না লিখতে চাও তাহলে আত্মজীবনী হিসেবে লেখো। আজকাল তো অনেকেই সেটা করছে।” মুশকিল হচ্ছে যে আমি কিছুতেই ভেবে পাই না যে আমার মত সাধারণ মানুষ, যার জীবনে কখনও কোনও exciting ঘটনা ঘটে নি, তার জীবনকাহিনী পড়তে কার উৎসাহ হবে? যেই দুজনের হতে পারত, তারা তো বাংলা পড়তেই পারে না। দিদিমার হাতের বড়া দিয়ে লাউয়ের ঘন্টার অমৃতের মত স্বাদের বর্ণনা কি Google Translate তাদের কাছে পৌঁছে দিতে পারবে?

আমার পথবিভ্রাটের সব গল্প লিখতে গেলে পুরো বই লেখা হয়ে যাবে। তাই যে ঘটনাটির কথা প্রথম মনে পড়ল সেটার কথাই লিখছি এখানে। এই গল্পের শুরু কিন্তু মোটেও হাসি পাওয়ার মত নয়। বরঞ্চ তার উল্টো। বহুবছর আগের কথা। আমার ছোটপুত্রের বয়স তখন ছমাস। দিনটা ছিল সোমবার। আসছে weekend এ তার অন্নপ্রাশণে শখানেক লোক নিমন্ত্রিত হয়েছে। তখন ক্লীভল্যান্ডে ভারতীয় restaurant বা caterer বলে কিছু ছিল না। নিজেদেরই রান্না করতে হত। অগত্যা কিছু কিছু রান্না তখনই শুরু করে দিয়েছি। হঠাৎ রাত্রিবেলা অপ্রত্যাশিতভাবে এক মর্মান্তিক সংবাদ পেলাম। আমার দিদি ফোন করে জানাল যে আগের দিন biopsy করে তার breast cancer ধরা পড়েছে এবং ডাক্তার পরের দিনই surgery

করবে বলেছে। আমার দিদির তখন চল্লিশ বছরও হয় নি। তখনকার দিনে যে কোনও cancer কেই প্রায় মৃত্যুদণ্ড হিসেবে ধরা হত। Radical mastectomy ছাড়া breast cancer এর তেমন আর কোনও চিকিৎসাও ছিল না। আমি খবরটা পেয়ে অনেকক্ষণ স্তম্ভিত হয়ে বসে রইলাম। এই দুঃসংবাদ বাবা মাকেই বা কিভাবে জানাব? আমার দিদি শিকাগোবাসিনী। দিদির মেয়ে তখন high school থেকে এক summer internship নিয়ে Washington গিয়েছে। ছেলে residential school এ পড়ে। তার তখনও ছুটি শুরু হয় নি। জামাইবাবুকে খুবই nervous মনে হল। আমি ঠিক করলাম এই অবস্থায় আমার ওখানে যাওয়া খুবই দরকার।

আমার কর্তার ছুটি নেই। পরেরদিন তাড়াতাড়ি office থেকে এসে আমাদের শিকাগো নিয়ে এলেন। আমার বড়পুত্রের বয়স তখন মাত্র আড়াই বছর। এই দুটি বাচ্চা এবং তাদের একরাশ জিনিষপত্র নিয়ে আমরা গভীর রাতে শিকাগো পৌঁছোলাম। প্রথম ধাক্কা খেলাম যখন দরজা খোলার পর দিদির হাসিমুখ দেখতে পেলাম না। জামাইবাবু আমাদের দেখে যেন ধড়ে প্রাণ পেলেন – “তুই এসে গিয়েছিস, এবার সব ঠিক হয়ে যাবে।” যদিও দুটি বাচ্চা নিয়ে লটর পটর করে আমি কি সুবিধে করতে পারব তা বুঝলাম না। শুনলাম সেইদিন সকালে দিদির surgery ঠিক মতন হয়ে গিয়েছে। জ্ঞান হওয়া পর্যন্ত জামাইবাবু সেখানে ছিলেন। দ্বিতীয় ধাক্কা খেলাম ওপরে শোবার ঘরে গিয়ে। আমরা এলে দিদি সবসময়েই বিছানা পত্র গুছিয়ে রাখত আমাদের জন্য তৈরী করে। জামাইবাবু তাঁর lab নিয়ে এত ব্যস্ত যে সংসারের খবর তেমন রাখেন না। আমি আলমারী থেকে নিজেই খুঁজে বিছানার চাদর, তোয়ালে ইত্যাদি বার করে শোওয়ার ব্যবস্থা করলাম। ঘরের লক্ষ্মীর অনুপস্থিতির শূন্যতা পদে পদেই অনুভব করলাম।

মাত্র কয়েকঘন্টা ঘুমিয়ে আমার কর্তা ভোরের আলো ফোটার সঙ্গে সঙ্গে ফেরৎ রওনা হয়ে গেলেন। আমি একটু বাড়ীর কাজে লাগলাম, যদিও বেশী কিছু করে উঠতে পারলাম না। আড়াই বছর বয়সে আমার বড় ছেলে তখন তার top form এ। সববিষয়ে তার প্রচন্ড কৌতুহল এবং খুব উর্বর মস্তিষ্ক। অসাধারণ ক্ষিপ্রগতিতে সে মুহূর্তের মধ্যে অনেক কিছু কুকর্ম করে ফেলতে পারে। নতুন বাড়ীতে নতুন নতুন জিনিষ দেখতে পেয়ে সে পরমানন্দে কালবৈশাখী ঝড়ের মত এক ঘর থেকে আর এক ঘরে ছুটে বেড়াচ্ছে। আমি জামাইবাবুকে বললাম ভেঙ্গে যাবার মত জিনিষপত্র সব ওপরে তুলে রাখতে। ছোট ছেলে আবার একেবারে দাদার উল্টো। সে অতীত শান্তশিষ্ট। তার দাবিদাওয়া তেমন নেই, আর কান্না শোনা যায় শুধু যখন নিয়ম করে চার ঘন্টা পরে পরে ক্ষিদে পায়। Solid খাবার তখনও শুরু করে নি, তাই সে সময়টায় মার খোঁজ পড়ে। বাকি সময়টা সে হয় ঘুমোয় বা হাসি হাসি মুখে সোফায় হেলান দিয়ে বসে আঙ্গুল চোষে।

বিকেল তিনটে নাগাদ আমরা দিদিকে দেখতে যাবার জন্য তৈরী হলাম। কর্তা ছেলেদের car seat দুটো রেখে গিয়েছিলেন। সেগুলো জামাইবাবুর গাড়ীতে লাগিয়ে আমরা রওনা হলাম। হাসপাতাল বাড়ী থেকে বেশ দূরে। তার নাম বা ঠিকানা আজ আর আমার মনে নেই। গিয়ে শুনলাম সেখানে বাচ্চাদের waiting room এর বাইরে যাওয়ার অনুমতি নেই। জামাইবাবু ওদের নিয়ে বাইরে গিয়ে সামনের traffic circle এর মাঝে ছোট্ট একটু সবুজ ঘাসে ঢাকা park এ ফুল, ফোয়ারা এসব দেখাতে নিয়ে গেলেন। দিদিকে দেখে আমার মনটা খুব খারাপ হয়ে গেল। খুবই painful operation, একটা হাত নাড়তে পারছে না। তবে দিদির মনের জোর অসাধারণ। জোর করে উঠে বসে আছে। আমাকে বলল, “তোমার জামাইবাবু খুব ভয় পাচ্ছিল। তুই আসাতে ওর অনেকটা স্বস্তি হবে।” আমি বেশীক্ষণ বসলাম না। বেরিয়ে দেখি আমি যা সন্দেহ করেছিলাম – ওদের সামলাতে গিয়ে জামাইবাবুর বিধ্বস্ত অবস্থা। Park এর চারদিকে ফুলের গাছ ছাড়া আর কোনওরকম railing নেই। তার চতুর্দিক দিয়ে হু হু করে গাড়ী ঘুরছে আর আমার বড় ছেলে দৌড়ে সেগুলো গেলার চেষ্টা করছে। তার মেসোমশাই পেছন পেছন ছুটছে তাকে ধরার জন্য, কিন্তু যেহেতু ছোট ছেলে তখনও ভাল করে বসতে পারে না, তাকে কোলে নিয়ে দৌড়তে হচ্ছে। আমি তাড়াতাড়ি গিয়ে ওনাকে মুক্তি দিলাম ও ছেলেদের নিয়ে গাড়ীতে গিয়ে বসলাম, যদিও underground parking lot এ বসে থাকাটা খুব pleasant বা safe নয়। অবশ্য জামাইবাবু খুব তাড়াতাড়ি ফিরে এলেন – দিদিই তাঁকে তাড়া দিয়েছে আমাদের কথা ভেবে।

পরেরদিন সকালে একটু রান্নাবাড়ার আয়োজন করতে হল। সেদিন দেশ থেকে পবিত্র মিত্র বলে দিদিদের এক অনেকদিনের পুরোনো বন্ধুর কার্যোপলক্ষে আসার কথা ছিল। দিদি আমাকে আগেই বলে রেখেছিল চিন্তা না করতো। পবিত্রদা নাকি খুব ভাল মানুষ আর প্রচন্ড রসিক লোক – “তোমার জামাইবাবু তো খুব বন্ধুবৎসল। উনি এলেই দেখবি তোদের সকলের মন ভাল হয়ে যাবে।” দুপুরবেলা জামাইবাবু ওনাকে নিয়ে এলেন airport থেকে। সামান্য যে খাবারের আয়োজন করতে পেরেছিলাম উনি তাই খুব খুশী হয়ে খেলেন বলে মনে হল। সত্যি খুব রসিক লোক। খুব আন্তে আন্তে কথা বলেন। আমার ছেলেদের সঙ্গে ওনার খুব ভাব হয়ে গেল। খাওয়া দাওয়ার একটু পরেই আবার হাসপাতাল যাওয়ার সময় হল। জামাইবাবু ঘোষণা করলেন – “তুই আজ একাই চলে যা। আমি আর পবিত্রদা দুজনে মিলে বাড়ীতেই তোমার ছেলেদের দেখাশোনা করব। Park এ বসে থাকার চেয়ে সেটা অনেক সহজ।” আমি তো মনে মনে প্রমাদ গুনলাম। আগের দিন ছেলেদের সামলাব বলে ওদের সঙ্গে পেছনে বসেছিলাম, রাস্তার দিকে মনোযোগ দিই নি। অর্থাৎ কিনা আমার রাস্তা চেনার যেসব visual cue থাকে – Walgreen এর পরই ডানদিকে ঘুরব, সবুজ bridge এর তলা দিয়ে যাবার পরই exit আসবে, পাঁচ রাস্তার মোড়ে ডানদিক থেকে দ্বিতীয় রাস্তায় ঢুকতে হবে, ইত্যাদি জরুরী তথ্য কিছুই মাথায় register করা হয় নি। জামাইবাবু ভাসা ভাসা কিছু নির্দেশ দিলেন কিন্তু বোঝাই গেল যে এবাড়ীর main navigator এর role টা ওনার নয়। যাই হোক। দুর্গা দুর্গা বলে দিদির গাড়ীতে চেপে বেরিয়ে পড়লাম এবং একসময়ে বিশেষ কোনও বামেলা ছাড়াই হাসপাতালে পৌঁছেও গেলাম। দিদির দেখলাম যথারীতি খুবই positive attitude. অনেকে দিদিকে দেখতে এসেছে, তাতেও খানিকটা ফল হয়েছে। ছোটবেলা থেকে চেনা আমার দাদার এক

বন্ধুর সঙ্গেও সেখানে দেখা হল। আমি একা এসেছি শুনে তিনি আঁতকে উঠে বললেন “তাড়াতাড়ি চলে যাও। এখনই rush hour এর traffic শুরু হয়ে যাবে।” আমার নিজেরও তাড়া ছিল। এতক্ষণে নিশ্চয়ই একজন মুখের থেকে আঙ্গুল বার করে মার খোঁজ শুরু করে দিয়েছে।

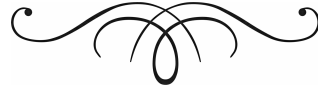
যাব বললেই যাওয়া যায় না। Underground Parking Garage এ গিয়ে বুঝলাম কোথায় park করেছি সেটা দেখতে ভুলে গিয়েছি। এ ভুল আমি আগেও দু'এক জায়গায় করেছি। Elevator এ করে ওপর নীচ, এদিক ওদিক হাঁটাচাঁটা করে ভাগ্যবশতঃ গাড়ীটা খুঁজে পেলাম, যদিও তাতে অনেকটা সময় নষ্ট হল। গাড়ীতে উঠতে গিয়ে দেখলাম চাবি দিয়ে গাড়ীর দরজা খুলছে না। অনেকভাবে নাড়াচাড়া করেও কিছু সুবিধে হল না। চিন্তায় আমার ঘাম হতে শুরু করল। গাড়ীটার চারদিকে ঘুরে ঘুরে ভাবতে লাগলাম কি করে ঢোকা যায়। আবিষ্কার করলাম যে এই গাড়ীটিও আমাদের গাড়ীর মতনই hatchback. সেই দরজাটা দেখলাম খুব সহজেই চাবি দিয়ে খুলে গেলাম। সেটা ভাল খবর, কারণ hatchback গাড়ীগুলোতে সাধারণতঃ পেছনের seatback গুলো ভাঁজ করে flat করে দেওয়া যায়। কিন্তু অনেক চেষ্টা করেও আমি সেই ভাঁজ করার mechanism টা খুঁজে পেলাম না। হয়ত সামনের দিকে আছে, আমি তাই দেখতে পাচ্ছি না। আমি তখন মরীয়া হয়ে উঠেছি। এদিক ওদিক তাকিয়ে দেখলাম কেউ কোথাও নেই। আমি তখন পেছনের trunk এ উঠে পড়লাম এবং হামাগুড়ি দিয়ে এগিয়ে seatback এর ওপর টপকে শরীরটাকে এগিয়ে দেবার চেষ্টা করতে থাকলাম যাতে পেছনের seat এ উঠে সামনের দরজার lock এ হাত পাই। তখন বয়স অনেক অল্প, শরীরের flexibility বেশী, তাও ব্যাপারটা খুব সহজ হচ্ছিল না। Seat এর পেছনটা অনেকটাই উঁচু। সেটা টপকাতে গিয়ে আমার কোমরটা সেখানে আটকে গেল। আমি V অক্ষরের মত তার দুদিকে ঝুলে পড়লাম। সামনের দিকে মাথাটা ঝুলে আছে, seat এর ওপরে দুহাত দিয়ে চেঁলে শরীরটাকে সোজা করার চেষ্টা করছি। পেছনদিকে গাড়ীর bumper এর ওপরে আমার কোলাপুরী পরিহিত পদযুগল ও শাড়ীর পাড় ঝুলে আছে। এই রকম সঙ্গী অবস্থায় হঠাৎ পায়ের দিকে খুব কাছের থেকে গম্গমে baritone এ এক পুরুষকণ্ঠে শুনতে পেলাম – “Is there a problem?” আমি এমন চমকে উঠলাম যে মাথাটা সামনের seat এর console এ একটা গুঁতো খেয়ে ঝিমঝিম করে উঠল। অনেক কষ্টে পেছনদিকে হামাগুড়ি দিয়ে শরীরটাকে টেনে বার করার চেষ্টা করতে লাগলাম। ঘাড়টা বেঁকিয়ে দেখলাম একজনের শরীরের শুধু মাঝের অংশটা দেখা যাচ্ছে – দেখলাম কালো pant এর কোমর থেকে একটি ছোট বন্দুকের case ঝুলছে। বলাই বাহুল্য, ব্যাপারটা খুব আশাপ্রদ মনে হল না। অবশেষে যখন বাইরে বেরিয়ে উঠে দাঁড়াতে পারলাম তখন দেখলাম গমগমে গলার মালিক এক security officer. সে আমার দিকে সন্দেহের চোখে তাকিয়ে প্রথমেই জিজ্ঞেস করল, “Are you the owner of the car?” বুঝলাম ব্যাপারটা কোনদিকে গড়াচ্ছে। ভয়ে ভয়ে তাকে পরিস্থিতিটা বর্ণনা করার পর সে “let me try” বলে আমার হাত থেকে চাবিটা নিয়ে খুব সহজেই একবারেই সামনের দরজাটা খুলে ফেলল। মনে মনে Chevy কোম্পানীর মুন্ডপাত করতে করতে আমি একটু অপ্রতিভ হাসি হেঁসে বললাম – “you must have the magic touch.” উত্তরে সে আরেকবার আমার দিকে সন্দেহের চোখে তাকিয়ে বলল, “drive safely.” আমি সেটা করতে পারব কিনা সে ব্যাপারে তার খুব আস্থা আছে বলে মনে হল না।

অনেকটা সময় পার হয়ে গিয়েছে। ওখান থেকে highway বেশী দূর না। আমি যখন সেখানে পৌঁছলাম তখন rush hour এর শেষের দিকের জের চলছে। চার পাঁচটা lane দিয়ে হু হু করে গাড়ী ছুটছে। মনে হল আমি যেন অসহায় ভাবে শ্রোতের জলের ঠেলায় উদ্দাম গতিতে ভেসে চলেছি। এক মুহূর্ত ইতস্তত করলেই চারদিক থেকে ভেঁপু বেজে উঠছে। আমাদের মফঃস্বল শহরে এত ভিড় তো হয়ই না, লোকেরাও অনেক বেশী ভদ্রভাবে চালায়। ডাইনে বাঁয়ে দুদিক দিয়ে exit বেরিয়ে যাচ্ছে। আমি ঠিক কোনদিকে আমার exit আসবে তা জানি না বলে মাঝামাঝি জায়গায় থাকার চেষ্টা করছি। তাও যখন অবশেষে হঠাৎ আমার exit এর sign দেখলাম তখন কিছুতেই সেদিকে যেতে পারলাম না। অভিন্যুর ব্যুহের মত মনে হল মধ্যখানে আটকে গিয়েছি। পাশের lane এর গাড়ীগুলো কোনটাই speed কমিয়ে আমাকে ঢুকতে দিতে রাজী হল না। ফলে চোখের সামনে আমার exit টি পেরিয়ে গেল। মনকে সাবুনা দিলাম এই ভেবে যে west যখন পেরিয়ে গেলাম তখন এর পরের exit টা নিশ্চয়ই east হবে। সে গুড়ে বালি। East বলে কোনও exit এল না। আমি তখন ভুল দিকে আর এগোব না ঠিক করে বেরিয়ে পড়লাম। Plan টা ছিল যে উল্টোদিক দিয়ে highway তে আবার ঢুকে এবার আগে থেকে সতর্ক হয়ে ঠিক জায়গায় বেরোব। বেরিয়েই কিন্তু বুঝলাম ভুল করেছি। জায়গাটা দেখে মনে হল সেটা একটা warehouse district. বিরাট বিরাট বাড়ীগুলোর parking lot একেবারে ফাঁকা। দিনের শেষে সেখানে কোথাও জনপ্রাণী নেই। তখন অন্ধকার হয়ে আসছে। রাস্তার আলোগুলো আস্তে আস্তে জ্বলে উঠছে। কোথাও কাউকে দেখতে পাচ্ছি না যে রাস্তা জিজ্ঞেস করব। বেশ ভয় ভয় করতে আরম্ভ করল। বলাই বাহুল্য, এসব ঘটেছিল cell phone, এমনকি car phone এরও আগের যুগে। আমি মরীয়া হয়ে glove compartment খেঁটে দেখতে লাগলাম যদি একটা map পাই। কিছুই পেলাম না, যদিও পেলেও আমি কিছু বুঝতে পারতাম কিনা সন্দেহ। একে map পড়তে পারি না, তার ওপর আবার একটাও রাস্তার নাম জানি না। বাধ্য হয়ে আমি সামনের দিকে যেতে থাকলাম। মাঝে মাঝে highway র আলো এবং গাড়ীগুলো দেখতে পাচ্ছি, কিন্তু ওঠার কোনও রাস্তা পাচ্ছি না। এভাবে কয়েক মাইল যাবার পর অল্প অল্প লোকালয় দেখা গেল। একটা gas station দেখতে পেয়ে আমার ধড়ে প্রাণ এল। তারাই আমাকে পথ বাতিয়ে দিল highway তে ওঠার।

সেদিন যে আমি কিভাবে বাকি রাস্তা চিনে বাড়ী ফিরে এসেছিলাম তা বলতে পারব না। এতদিন পরে তার সব details ও আর মনে নেই। দিদির বাড়ীতে পৌঁছোবার অনেক আগেই আমার চার ঘন্টার মেয়াদ ফুরিয়ে গিয়েছে। রাত হয়ে গিয়েছিল। Driveway তে ওঠার আগেই দেখলাম বাড়ীতে আলো জ্বলছে, খোলা জানালা দিয়ে পর্দা উড়ছে, এবং আমার ছোট ছেলের কানফাটানো কান্না শোনা যাচ্ছে। হঠাৎ দেখলাম বাড়ী অন্ধকার হয়ে গেল। কি ব্যাপার, electricity চলে গেল? কিন্তু পরের মুহূর্তেই দেখলাম আবার আলো জ্বলে উঠল – আলো জ্বলছে, নিবছে।

জামাইবাবুর হুঙ্কার শুনতে পেলাম – “stop right now!” বুঝলাম আমার বড় ছেলে আলোর switch এর সন্ধান পেয়েছে। Garage এর দরজা দিয়ে বাড়ীতে যখন ঢুকছি তখন পবিত্রদার শান্ত গলা শুনতে পেলাম – “বাবা, ভগবানকে ডাকো। বল, ঠাকুর আমায় সুমতি দাও।”

এর দুদিন পরে সকালে দিদি বাড়ী ফিরে আসে। বলাই বাহুল্য, আমি হাসপাতালে আর যাই নি। অনেক অনিচ্ছা সত্ত্বেও আমি দিদি বাড়ী আসার সঙ্গে সঙ্গেই ফিরে আসতে বাধ্য হয়েছিলাম। তার তিনদিন পরেই আমাদের অনুষ্ঠান। আমি দিদিকে family room এ শোওয়ার ব্যবস্থা করে দিয়ে ভারাক্রান্ত মনে চলে এলাম। দিদির অবশ্য অসম্ভব মনের জোর। ডাক্তার এবং আমাদের সকলের নিষেধ অবজ্ঞা করে দিদি গাড়ীর পেছনের seat এ শুয়ে তিনদিন পরেই Cleveland এ এসেছিল আমার ছেলের অন্নপ্রাশনের নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে। এই ঘটনার পর বছর কেটে গিয়েছে। পবিত্রদা শুনেছি গত হয়েছেন বেশ কিছুদিন আগে। আমার সেই মুখে আঙ্গুল চোষা ছেলে এখন শিকাগোতেই থাকে। গত সপ্তাহে একটি বিয়েতে শিকাগো গিয়ে প্রথমে তার বাড়ীতেই ছিলাম। দিদিরা আজও সেই একই বাড়ীতে থাকে। মাথার চুলে পাক ধরেছে, দৃষ্টিশক্তি, স্মৃতিশক্তি ক্ষীয়মাণ, কিন্তু আগের মতই হাসিমুখে দুজনে আমাদের অভ্যর্থনা জানালেন। আমার দিক্জ্ঞানের কোনও উন্নতি তো হয়ই নি, বরঞ্চ অবনতি ঘটেছে। ভাগ্যক্রমে আমাকে আজকাল আর তেমন গাড়ী চালাতে হয় না। আমার পথবিভ্রাটের গল্পের supply ও তাই আস্তে আস্তে কমে আসছে, কারণ নতুন রসালো অভিজ্ঞতা আর তেমন হয় না।



জনশ্রুতি আছে, মধ্যযুগে রাজশাহীর তাহিরপুরের রাজা কংসনারায়ণ ঐতিহাসিকভাবে বঙ্গদেশে সর্বপ্রথম মহাআড়ম্বরে শারদীয়া দুর্গাপূজা উদযাপন শুরু করেছিলেন। অষ্টাদশ শতাব্দীতে নদিয়ার রাজা কৃষ্ণচন্দ্র নতুন রীতি প্রচলন করে মহালয়ার দিন থেকে শুরু করলেন সকলের মঙ্গলকামনায় যজ্ঞ, টানা নবমী পর্যন্ত চলত সেই যজ্ঞ। কথিত আছে, মহালয়ার পর থেকে নাকি কখনও আঙুন নিভত না যজ্ঞেরা দেবী এখানে রাজরাজেশ্বরী, শক্তির প্রতীক। তাই যোদ্ধাবেশী। দেবীর বাহন এখানে সিংহরূপী। এখনও সেই প্রথা মেনেই রাজবাড়িতে পূজো হয় একচালার যোদ্ধা দেবীর। প্রতিমার মাটি মাখতে ব্যবহার করা হয় শুধুমাত্র গঙ্গাজল। নবদ্বীপ থেকে নিয়ে আসা হয় সেই জল। আগে পূজোতে বাড়ির মহিলারা উপস্থিত থাকলেও প্রতিমা নিরঞ্জনের সময় দেবীর সঙ্গে যাওয়ার নিয়ম ছিল না। তখন নীলকণ্ঠ পাখি দেবীপ্রতিমার সঙ্গে ভাসানে যেত। ভাসান হয়ে গেলেই সে ফিরে আসত রাজবাড়ির বারান্দায়; এরপর অন্দরমহলে শুরু হয়ে যেত বিজয়ার প্রস্তুতি। এখন আর রাজবাড়ির পূজোতে সেই জৌলুস না থাকলেও রয়ে গিয়েছে আচার রীতি। এখনও দেবীর পূজোয় ব্যবহার করা হয় ১০৮ টি ফোটা পদ্মা জল আনা হয় নবদ্বীপের গঙ্গা থেকে। আগে পূজোর পরে তৈরি হত মাটির অসুর মূর্তি। রাজা তিরধনুক নিয়ে বধ করতেন তাকে। সে রীতিও এখন আর নেই। তবে এখনও দেশ বিদেশের লোক পূজোর সময় সকলে আমন্ত্রিত হন রাজ দালানে।

Best Wishes and Puja Greetings



TATINI AND SANCHITA MAL SARKAR

সবাইকে শারদীয় অভিনন্দন



সৌমিত্র, মুক্তা, সোহন ও শালীন

**May Ma Durga Bring All Happiness To You
And Your Family**



শুভ বিজয়া

শুভ বিজয়া

**SOMA, SUBHRA, SANHITA, AND SADHAN JANA
FAIRLAWN, OH**

Taste Of Kerala
Authentic South-Indian Takeaway



5850 Mayfield Road | Mayfield Heights OH - 44124
Phone: 440-461-9212/9242
3429 West Bratnard Rd, Woodmere, OH 44122

Timings

Monday : Closed
Tue - Thu : 11am - 9pm
Friday : 11am - 9pm
Saturday : 12pm - 9pm
Sunday : 12pm - 7pm

Holidays

Thanksgiving day
Christmas
New Year

We serve Halal meat

The Approval

Taniya Talukdar

It was a breezy late December evening in Kolkata 2013 when I first met the late, great Dr. Bijon Kumar Roy.

I was a 32-year-old single, independent woman and a well-established journalist who had interviewed some of India's top celebs, and even had a session with the Dalai Lama! But none of that prepared me for this, especially since I was essentially the interviewee!

Of course, my knight in shining armour, Bikram, didn't help my cause by springing our plans on his poor unsuspecting father less than 24 hours prior, 2.5 months before our proposed "D-day" (and 9 months after our relationship began!). This bloody fellow also kindly informed me the night before that the meeting could go one of two ways - we either hit it off right away, or he would reject the marriage on the spot, talk about pressure!

Fortunately, the ice was thawed earlier that day by future mother-in-law who I met for the first time at lunch with her girlfriends and Bik at the famous "Tolly Club". Everyone was warm and funny, which made me feel welcomed and less anxious. But my stomach was re-filled with butterflies as we made our way to their flat on Panditya Road to have the grand meeting with man, the myth, the legend.

As Bik's mom opened the front door to their condo, I could see a man in a pair of dark grey shorts sitting on the couch peering curiously towards the door to see the girl his first born had chosen to marry, an Indian girl no less! It seems he was really concerned when initially hearing this news from Bikram. He passionately yelled "*What kind of family is she from!? How will I know you will be in good hands when me and Mommy are long gone?!*"

I don't blame him, we've all heard the horror stories of an American-born-*desi* marrying an Indian, etc. Especially if he's a "*hamburger khawar chele*" like Dr. Roy is on record of calling him, haha. Plus of course, what if all I wanted was a free pass to the US and a green card??

I slowly walked in and sat gingerly at the other edge of the couch and started nervously conversing with him in English. Couple minutes into our conversation, both of us realized that we both grew up in Assam, and from that point on we were both instantly at ease and began conversing in Banglish (and did so ever since!).

He was taken in with my profession and a bit starstruck after I purposely name-dropped a few Bollywood actors I had the privilege of recently interviewing! (That was one tip Bik was right about, thanks babe!) We continued to speak about our Assam connection and reminisced about our love for *aloo sheddo bhaat*, and passion for *jalebis*. We spoke for maybe 30-40 minutes and by the end of it, I knew that I had impressed Bijon Roy, enough for him to accept me as his future daughter-in-law, but he also impressed me very much as well!

Now the next meeting was between all the parents, and yes, it was in a day's time! The moment my Maa and Baba walked in through the door, I heard my future father-in-law say, "We like your daughter." and he gave my Dad a big hug. And since then, our families were tied together forever. I was accepted as part of the Roy family from there on and my responsibilities began.

Bik's siblings Shawn (and his recent bride Melina) and Samantha had traveled to India a day or so later, as my in-laws were hosting a reception for my future brother and sister-in-law in Kolkata. They insisted that I should attend so I could meet all their relatives and family friends in India.

If that wasn't enough, Sadhan Uncle (Dr. Sadhan Jana) and Soma Aunty were celebrating their 25th wedding anniversary the very next day and my in-laws asked me to attend it also. The back-to-back event pressure brought all my previously alleviated anxieties back, but what lovely events they both were, and I must say, I feel very blessed to have been introduced so kindly by my future-in-laws and received so warmly by their family and friends.

The next day I returned to Bangalore, and Bikram went back to the US while my in-laws stayed on in Kolkata, our wedding date was set for March 7, 2014, in Kolkata, just a short 9 weeks away!

One evening later that week while I was working out at the gym in my mad dash to get in shape, I saw a call from a Kolkata number. Bik and I were in the middle of wedding planning, so I stepped out to take the call and was pleasantly surprised that it was my future father-in-law who called to 'check' on his future daughter-in-law. Needless to say, I was super thrilled, and yes, he would surprise me like that many times later too.

In the next 2 months we often exchanged emails as he would request me to send him links of my articles published in Bangalore Times and he would always reply by telling me I was talented storyteller. He became one of my biggest confidence boosters I must say. He loved reading and as most people who knew him know, he has a great gift for storytelling! He would end up writing a few fascinating stories from his days in Assam that would transport me back there as well.

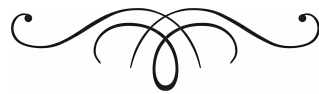
Our wedding took place without a hitch, and everyone thoroughly enjoyed. Soon after my in-laws went back to the US while Bikram and I returned to Bangalore. Our initial plan was for Bik to stay in India only a few weeks and then return to the US while I waited for my US visa to get processed which we thought would be within 6 months or so. But my father-in-law asked Bik to stay with me in India to avoid 'any future mishaps.'

Fast-forward to Oct '15, the visa ended up taking nearly 18 months! Then we waited another 6 months to avoid the frozen tundra of Cleveland (another time the hubby was right!). But through my father-in-law's encouragement (and insistence), Bik somehow "survived" living in India for nearly 2 years, with hardly any hamburgers the poor guy!

I don't know if it's the Assam connection or what, but from the moment we met I didn't feel any ounce of judgement from him and always felt like he supported me and had my best interests at heart. That's why it was so easy and seamless for me to also call him Baba, which until then I only reserved for the #1 man in my life. I feel very blessed to know what it feels like to have 2 Dads, even if it was for only a precious short time.

RIP Baba, I know you must be enjoying yourself with bottomless bowls of kosha mangsho. aloo sheddo bhaat, and jalebis, just one more kind request from your Bouma, please save some for me!

My 2 Dads



শুভ বিজয়ার প্রীতি ও শুভেচ্ছা জানাই



ভাস্বতী, অনসূয়া ও স্মরজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায়

Puja Greetings & Best Wishes



From.....

Deeya, Prithviraj, Babita and Dhurjati Basu

Martin Benade



Martin Benade
(216) 431-1112
Fax (216) 431-0984

3507 Carnegie Avenue
Cleveland, Ohio 44115

Auto Body Repairs

All body repairs, from a little scratch to a lease turn-in fix-up to a major collision repair.

We work with all insurance companies, and help with saving insurance deductible costs.

Complete mechanical repairs.

Fair and honest, prices always reasonable.
Our 30th year in business.

Shuttle to downtown and Cleveland Clinic.
Open: Monday through Friday + Saturday (morning)

artisan3507@gmail.com

Puja Greetings & Best Wishes

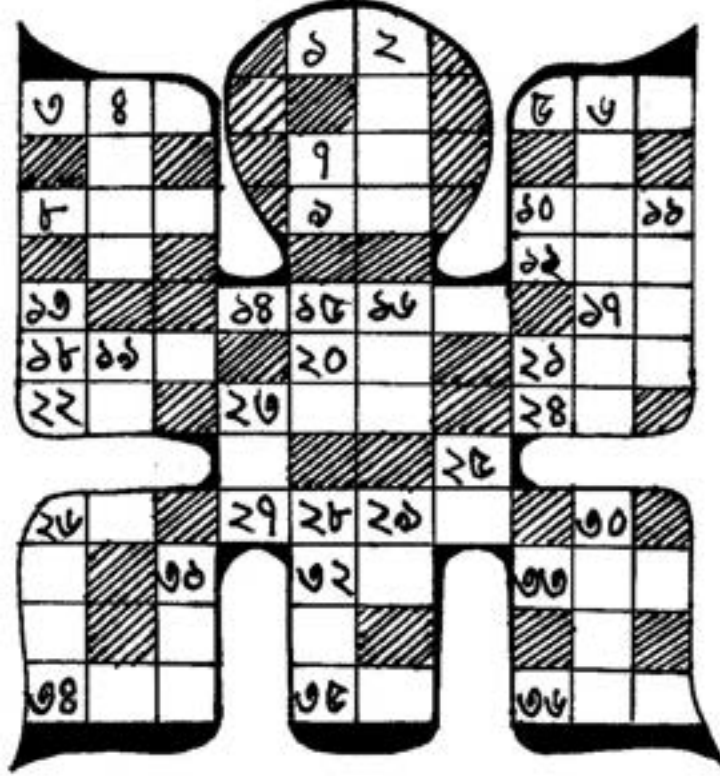
From

Julie-Anne, Monica,

Kathy & Anjan Ghose

শব্দস্বস্তিকা

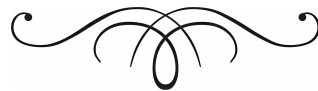
অমৃতা নন্দী



পাশাপাশি: ১. _ এ প্রভাতে রবির কর ৩. চঞ্চল ৫. নদী ৭. ভেঙে মোর ঘরের _ নিয়ে যাবি ৮. গহুর, সমরেশ বসুর উপন্যাস ৯. আশায় বাঁচে _ ১০. প্রয়োজন ১২. _ চূড় ১৪. আশ্বিন পূর্ণিমা ১৭. ধ্বংস/বিনাশ ১৮. _ বীক্ষ্য, অভিজ্ঞান শকুন্তলমের শ্লোকাংশ, সুবোধ চন্দ্র চক্রবর্তীর অসামান্য ভ্রমণ সংকলন ২০. খ্রিস্টীয় ৮ম-১২০০ শতাব্দীতে রাজত্বকারী ভারতীয় উপমহাদেশের (উৎসস্থল বাংলা) এক সাম্রাজ্য ২১. ধার্য/নির্দিষ্ট সময়সীমা ২২. ইষ্টমন্ত্রাদির বারংবার উচ্চারণ ২৩. কাকুতি/বিনীত অনুরোধ ২৪. আলায় ২৬. মরুজাহাজ ২৭. বিনা নিমন্ত্রণে আগত ৩২. সঙ্গীতের স্বরবিস্তার/সুরের আলাপ ৩৩. বৃক্ষ ৩৪. গাল/গন্ড ৩৫. নর্তকী/অভিনেত্রী ৩৬. বড় ও ধীরগামী নৌকাবিশেষ

উপরনীচ: ২. বেঁচে থাকার ইচ্ছা ৪. পূজাদি মাঙ্গলিক অনুষ্ঠানে পরিধেয় রেশমের কাপড়বিশেষ ৬. ৭০ এর দশকের এক বিখ্যাত রাজনৈতিক নাটক ৭. পিতৃব্য ১০. _ রাজি ১১. লোকালয় ১৩. পান গাছের ক্ষেত ১৫. নিপ্পন ১৬. ভ্রান্তি/ত্রুটি ১৯. মানচিত্র ২১. জলদ ২৩. পিরামিডের দেশ ২৫. বয়ন যন্ত্র ২৬. আরুণির জন্ম নাম, আইল থেকে উথিত ২৮. গবাক্ষ ২৯. শক _ দল পাঠান মোগল এক দেহে হল লীন ৩০. দেবাদিদেব মহাদেবের এক নাম ৩১. গাছের ছাল

(উত্তর ৬৬ পাতায়)



Asian Imports

Indian Food Market

26885 Brookpark Extn, North Olmsted, Ohio 44070

440-777-8101

- Indian Groceries & Food
- Indian Pickles & Spices
- Exotic Ice Cream & Drinks
- Frozen Foods & Breads
- Fresh Vegetables
- Indian Dresses & Jewelry

We accept Food Stamps

Monday-Saturday: 10:30 - 7:30; Sunday 10:30 - 5:30



শুভ শারদীয়া



Wish you all a HAPPY BIJOYA

Monika, Anika and Deep Samanta

চাল পটল

রুমা বিশ্বাস

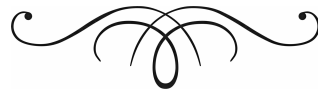


উপকরণ:

পটল- ১৫ টা
আতপ চাল- ২ টেবিল চামচ
পেঁয়াজ- ১টা মাঝারি সাইজের
আদা- ১ ইঞ্চি
হলুদ গুঁড়ো- ১/২ চামচ
লক্ষা গুঁড়ো- পরিমাণ মত
দারচিনি- ছোট এক টুকরো
এলাচ- ৪/৫ টা
লবঙ্গ- ৪/৫ টা
তেজপাতা- ২ টো
নুন, চিনি, ঘি, তেল, গরম মশলা গুঁড়ো- আন্দাজ মত

প্রণালী:

প্রথমে পটল গুলোর খোসা ছাড়িয়ে গোটা পটলের ওপর ও নীচের দিকটা একটু চিরে দিতে হবে। পেঁয়াজের অর্ধেকটা কুচিয়ে রাখতে হবে। বাকি অর্ধেকটা আদার সঙ্গে বেটে নিতে হবে। আতপ চালটা ভাল করে ধুয়ে জলে ভিজিয়ে রাখতে হবে। এরপর পটল তেলে ভেজে তুলে রাখতে হবে। অন্য প্যানে অল্প তেল গরম করে গোটা দারচিনি, এলাচ, লবঙ্গ, তেজপাতা দিতে হবে। একটু নাড়াচাড়া করে তার মধ্যে কুচানো পেঁয়াজ দিতে হবে ও অল্প আঁচে ভাজতে হবে। খেয়াল রাখতে হবে যেন পেঁয়াজ পুড়ে না যায়। পেঁয়াজের রঙ যখন হালকা বাদামী হবে তখন এর মধ্যে আদা, পেঁয়াজ বাটা দিয়ে কষতে হবে। কষার সময় গুঁড়ো হলুদ, নুন ও লক্ষা দিতে হবে। দু-তিন মিনিট কষানোর পরে ভেজানো আতপ চাল দিয়ে আরো ২/৩ মিনিট কষতে হবে। এরপরে ভাজা পটল গুলো দিয়ে মিনিট খানেক কষানোর পরে জল দিয়ে ঢাকা বন্ধ করে ফুটতে দিতে হবে। কয়েক মিনিট বাদে চাল ও পটল সেক্ষ হয়ে গেলে একটু ঘি, গরম মশলা ও চিনি দিতে হবে। আঁচ বন্ধ করে ঢাকা দিয়ে রেখে দিলেই হয়ে যাবে সুস্বাদু চাল পটল।



Puja Greetings



**RISHAN, DEBJANI, DEBORSHI, BAISHAKHI,
INDRANI, ISHA & DIPTI PROKASH ROY**

Cleveland's BEST FISH Market

Fresh Shrimp

Fresh Buffalo

Fresh Shad

All fish dressed to order at
NO EXTRA CHARGE

We also carry Goat & Lamb meat

**FARM HOUSE FOOD
DISTRIBUTORS**

2 LOCATIONS

9000 Woodland Avenue (216)791-6948
20524 Southgate Park Blvd. (216)587-6767

সে-নাম রয়ে যাবে

সুজয় দত্ত

হ্যাঁ, কাগজে বা পাথরে নাম লেখা যে বুদ্ধিমানের কাজ নয়, সে তো এক কিংবদন্তী গায়ক কবেই বলে গেছেন। তবে তাঁর গানের তৃতীয় লাইনে নামের অমরত্বের যে পস্থা বাতলানো আছে, আজকের যুগে তা পুরোনো দশ পয়সার কয়েনের মতোই অচল। পশ্চিমী দুনিয়ার কথা ছেড়ে দেওয়া যাক (সেখানে হৃদয় দেওয়ানেওয়া নামক ট্রায়াল-এররের খেলাটা অনেকদিন থেকেই স্বাভাবিক জীবনের অঙ্গ), ফিল্মী তারকাদের গ্ল্যামার-জগতের কথাও ব্যাড দিলাম (সেখানে ঘনঘন প্রণয়সঙ্গী বা সঙ্গিনী বদলানোটা ডিশওয়াশার বা শেভিং ক্রীমের ব্র্যান্ড বদলানোর মতো শুধু প্রত্যাশিতই নয়, মিডিয়া আর পাপারাৎজির কাছে পরম-আকাঙ্ক্ষিত), আমাদের এই পোড়া বঙ্গদেশের আধুনিক তরুণসমাজের কাছেও প্রেম-ভালোবাসা ব্যাপারটা প্রায় সার্কাসের ট্র্যাপিজ খেলার পর্যায়ে এসে দাঁড়িয়েছে। আজ একে ছাড়ছে তো কাল ওকে ধরছে। শুধু তাই নয়, সোশ্যাল মিডিয়ায় সদর্পে ঘোষণা করছে নিজের ধরা-ছাড়ার স্ট্যাটাস। ওটাই এ যুগের স্ট্যাটাস সিম্বল। অতএব আজকাল হৃদয়ে নাম লিখে বেশীদিন টিকিয়ে রাখার আশা অবাস্তব। তাহলে এ-পৃথিবীতে বেঁচে থাকবে কী করে মানুষের নাম? না, বিখ্যাত আর কুখ্যাতদের কথা বলছি না, তাদের ব্যাপারটাই আলাদা। বলছি আমার-আপনার কথা। 'চালাক চতুর' মুঠিফোন যদি কজায় থাকে, তাহলে একটা সোজা উপায় হলো বিভিন্ন সোশ্যাল মিডিয়ায় অনেকগুলো একাউন্ট খুলে ফেলা। তখন আর লোকে চাইলেও ভুলতে পারবে না। প্রতিদিন তাদের ফোন টিং টিং করে মনে করিয়ে দেবে অমুকে এইমাত্র ঘুম থেকে উঠে ব্রেকফাস্টের লুচি-আলুচচ্চড়ির ছবি পোস্ট করেছে, অমুকে একটা সিনেমা দেখে এসে এক্ষুণি দুটো মন্তব্য করেছে আর তাতে সাঁইতিরিশ জন হেসেছে (মানে হাসিমুখের ইমোজি পাঠিয়েছে আরকি), অমুকে লিখেছে সামনে পরীক্ষা বলে এখন টেনশনে আছে, ইত্যাদি ইত্যাদি। শুধু তাই নয়, বছরের বিশেষ বিশেষ দিনে আপনার কর্তব্যবোধেও সুডসুড়ি দেবে -- অমুকের আজ পঁচিশতম বিবাহবার্ষিকী বা তমুকের কাল জন্মদিন, শুভেচ্ছা জানালে না? বিজ্ঞানীরা বলেন মানুষের বিবর্তন নাকি এখনো জারি আছে। সুতরাং আশা করা যায় অচিরেই সোশ্যাল মিডিয়া মনে করিয়ে না দিলে লোকে নিজের জন্মদিনটাও ভুলে যাবে, অথবা শিশুরা মস্তিষ্কে হিপ্পোক্যাম্পাসের বদলে স্মার্টফোন নিয়ে জন্মাবে।

তার মানে কি এ-জগতে স্মার্টফোন-হীন সাধারণ মানুষের একমাত্র ভবিষ্যৎ বিস্মৃতির অতল গহ্বর? ভয় নেই, ব্যাপারটা অতটা হতাশাজনক নয়। আপনি-আমি যখন হাফপ্যান্ট পরে ডান্ডাগুলি (বা ফ্রক পরে খেলনাবাটি) খেলে বেড়াইতাম, কিংবা প্রাইমারী স্কুলের করিডোরে পড়া না পেরে নীলডাউন হয়ে থাকতাম, তখন স্মার্টফোন কোথায়? স্টিভ জবস তখনও ভর্তিই হয়নি কলেজে, ড্রপআউট হওয়া বা 'আপেল' ফলানো তো দূরের কথা। কিন্তু সেই সময়কার খেলার সাথীদের বা স্কুলের সহপাঠীদের কারো কারো নাম এখনো কেন মনে আছে বলুন তো? না না, যে বিচ্ছু ছেলেটার ডান্ডার ঘায়ে আপনার হাঁটু ফুলেছিলো বা যে বিশ্বাসঘাতক ক্লাস-মনিটর আপনার নামে টাচারের কাছে নালিশ করেছিল হুটোপাটি করেছেন বলে, শুধু তাদের নাম নয় -- আরো কিছু নিরীহ নামও দেখবেন স্মৃতিতে রয়ে গেছে। তার কারণ সম্ভবতঃ যার নাম সেই মানুষটা নয় -- নামটারই নিজস্ব বিশেষত্ব।

যেমন ধরা যাক কারো নাম যদি অর্ধেন্দু পুরকায়স্থ হয়? ধরতে হবেনা, অনেক ছোটবেলায় আমার সতাই ওই নামের এক সহপাঠী ছিল। তাকে আমরা ডাকতাম 'হাফ ফুল' বলে (অর্থাৎ 'অর্ধ' আর 'পুরো'র ইংরেজী)। এতে সে নিজে যত না রাগত, তার চেয়ে বেশী ক্ষেপে যেত ওর দাদা কৃষ্ণেন্দু -- আমাদের দু-ক্লাস ওপরের। নিশ্চয়ই 'ফুল'-এর অন্য বানান করতো মনে মনে। এই নামটা স্মরণীয় হয়ে থাকার আরো কারণ হলো, ছেলেটার কাছে শুনেছিলাম ওদের একানবতী পরিবারে বিভিন্ন প্রজন্মের সব ছেলেদের নামই 'ইন্দু' দিয়ে। ওর বাবারা তিন ভাই, তাঁদের নাম পূর্ণেন্দু, সিতেন্দু আর শরদিন্দু। প্রয়াত ঠাকুরদা ছিলেন প্রণবেন্দু। জ্যাঠাতুতো দাদা অমলেন্দু আর খুড়তুতো ভাই দীপেন্দু, ইত্যাদি। এ জিনিস আমি আমার ছাত্রজীবনে আর একবারই দেখেছি। কলেজে পূজা পরাঙ্গপে বলে এক মারাঠী ছাত্রী ছিল আমার তিন বছরের সিনিয়র। ও বলতো ওর মা, মাসী আর মামাতো-মাসতুতো সব দাদাদিদিদের নাম নাকি পূজোকেন্দ্রিক। দুই দিদি অর্চনা ও অঞ্জলি, মামাতো আর মাসতুতো দাদারা যথাক্রমে প্রসাদ ও নৈবেদ্য, মা আরাধনা এবং মাসী উপাসনা। বলুন তো, এরকম ব্যাপার কখনো ভোলা যায়?

ঠিক যেমন ভোলা যায়না বাঙালীদের নাম বিদেশী নামের অনুকরণে রাখলো। এটা সাধারণতঃ দুভাবে হয়ে থাকে। হুবহু কোনো বিখ্যাত বিদেশী নাম তুলে এনে বিষিয়ে দেওয়া, অথবা বিদেশী নামটার সঙ্গে দারুন সাদৃশ্য আছে এমন কোনো বাংলা নাম ব্যবহার করা। খ্যাতনামা ইংরেজ ফুটবলার ও ক্রিকেটার ডেনিস কম্পটনের নামেই যে কলকাতার একটি ঐতিহাসিক ফুটবল ক্লাবের এককালের অপরিহার্য রাইট ব্যাকের নামকরণ হয়েছিল কম্পটন দত্ত, তা না জানলেও আন্দাজ করা যায়। অধুনা ভারতীয় ক্রিকেট দলের একজন উঠতি প্রতিশ্রুতিমান খেলোয়াড়ের নাম (ওয়াশিংটন সুন্দর) আমেরিকার প্রথম রাষ্ট্রপতির থেকে ধার করা। যে বিখ্যাত রুশ সাহিত্যিকের নামানুসারে সমরেশ বসু তাঁর এককালের জনপ্রিয়

কিশোর চরিত্রটির নামকরণ করেছিলেন, আধুনিক প্রজন্মের প্রথিতযশা ঔপন্যাসিক বুস্পা লাহিড়ীর এক সাড়াজাগানো উপন্যাসের নায়কও ছেলের নাম রেখেছেন সেই নিকোলাই গোগোলের নামেই। এছাড়া ম্যাক্সিম গোর্কি আর নিকোলাই অস্ত্রোভস্কির দুই কালজয়ী বৈপ্লবিক উপন্যাসের নায়কের নাম (পাভেল) শুধু বাংলা সাহিত্যেই ব্যবহৃত হয়নি, বাঙালী ছেলেদের ডাকনামও হয়েছে। বিদেশী নামের সঙ্গে ধ্বনিগত সাদৃশ্যের তালিকায় প্রথমেই মনে আসা উচিত ছোটবেলার রূপকথার গল্পের সেই রূপাঞ্জলির কথা, এক উঁচু মিনারের ওপর নিঃসঙ্গ কারাকক্ষে যে ছিল বন্দী আর তার সঙ্গে রাজপুত্রের গোপন সাক্ষাতের একমাত্র উপায় তার লম্বা চুল বেয়ে ওপরে ওঠা। রূপাঞ্জলি যে জার্মানীর গ্রিম-ভাইদের রূপকথামালার অন্যতম চরিত্র রাপানজেল, তা আর বলে দিতে হবে না। পরশুরামের গল্পেও আমরা দেখি এলিজাবেথ বা বেটসি হয়ে যায় বেতসী চাকলাদার আর শার্লক হোমসের বাঙালী সংস্করণ দাঁড়ায় সরলাক্ষ হোম। সাম্প্রতিককালে বাংলা ছায়াছবি আর গানের জগতে লকেট আর রকেট নামদুটো হয়তো শুনে থাকবেন অনেকে।

কিন্তু এ তো গেল বিখ্যাত আর আধা-বিখ্যাতদের কথা। আগেই বলেছি না, এ লেখা শুধু তাদের নিয়ে নয়? আমার এক দিল্লিনিবাসী প্রাপ্তন সহপাঠীর বাবা বিজ্ঞানভিত্তিক কল্পকাহিনীর জনপ্রিয় লেখক আইজ্যাক আসিমভের এতোই ভক্ত ছিলেন যে ছোটছেলের নাম রেখেছিলেন অসীমাভ। তার দাদার (অর্থাৎ আমার বন্ধুর) নাম অমিতাভ হওয়ায় বেশ ছন্দমিলও ছিল। হাইস্কুলে আমার চেয়ে বেশ কয়েক বছরের সিনিয়র একটি ছেলে হায়ার সেকেন্ডারীতে দারুন রেজাল্ট করে খড়াপুর আই আই টিতে কম্পিউটার সায়েন্স পড়তে ঢুকেছিল। কাকতালীয়ভাবে ঠিক সেই সময়েই আমেরিকায় প্রথম সহজে বহনযোগ্য (পোর্টেবল) কম্পিউটার বাণিজ্যিকভাবে বাজারে ছাড়ে অসবোর্ন কম্পিউটার কর্পোরেশন, যা আশির দশকের গোড়ার দিকে খুব জনপ্রিয় হয়। পরে সেই সংস্থার প্রতিষ্ঠাতা এডাম অসবোর্ন যখন শেষজীবনে ভারতের তামিলনাড়ুতে থাকতেন, আমার স্কুলের সেই ছেলেটি চাকরিসূত্রে ওঁর সান্নিধ্যে আসারও সুযোগ পায়। তাই আমার দৃঢ় বিশ্বাস, ও যে নিজের একমাত্র ছেলের নাম রেখেছিল অসবর্ণ -- সেটা আদৌ কাকতালীয় নয়। পরবর্তীকালে আমার এক কলেজের বন্ধুর মুখে শুনেছিলাম তার জনৈক দূরসম্পর্কের আত্মীয় দীর্ঘদিন বিলেতে থাকার পর এক আইরিশ মহিলাকে বিয়ে করেন এবং তাঁর শাশুড়ির নামে (বার্নার্ডেট) প্রথম সন্তানের নাম রাখেন বর্ণাদিত্য। যাইহোক, এই প্রসঙ্গ শেষ করি আমার একেবারে ছোটবেলার একটা স্মৃতি দিয়ে। আমি যখন ক্লাস ওয়ানে, সেই সময় আমার মাসীর বাড়ীর ঠিক উল্টোদিকে যে পরিবারটি ভাড়া থাকত তাদের দুই মেয়ের নাম ছিল বিউটি আর কিউটি। আজও মনে পড়ে বাড়ীর বড়রা রসিকতা করে বলতেন ওদের আরও একটা মেয়ে হলে তার নাম কি হবে ডিউটি?

অনেকসময় বিদেশী নামের অনুকরণ করার ইচ্ছে না থাকলেও সেটা এড়ানো যায়না। বাংলায় অনীতা রায় বা রীতা দে -- এই নামগুলো বহুলপ্রচলিত। পশ্চিমী দুনিয়ায় এসে মালুম হলো ইংরেজীতে Anita Ray আর Rita Day-ও বিরল নয়। মুশকিল হচ্ছে, যেহেতু রায় আর দে কে ইংরেজীতে অনেকরকম বানানে লেখা যায়, বিলেত-আমেরিকায় Anita Ray বা Rita Day দেখলে চট করে বোঝা কঠিন ওটা সেখানকারই কোনো নাগরিকের নাম না বাংলা থেকে আসা কোনো অভিবাসীর (বা তার দ্বিতীয় প্রজন্মের)। আমার নিজের একবার এদেশে এরকম অভিজ্ঞতা হয়েছিল। ছাত্রাবস্থায় প্রথম যখন ইউনিভার্সিটির ডরমিটরি ছেড়ে বাইরে এপার্টমেন্ট নেবো ঠিক করলাম, একদিন এক এপার্টমেন্ট কমপ্লেক্সে গিয়ে দেখি লিজিং অফিসের দরজায় ম্যানেজারের নাম লেখা আছে Chandra Paul। আমি তো খুব খুশী। নিশ্চয়ই বাঙালী ম্যানেজার, স্বজাতীয় বুঝলে ভাড়া না কমাতে একটু বাড়তি সাহায্য তো করবে। ওমা, দরজা ঠেলে অফিসে ঢুকে দেখি ভারী চেহারার এক মধ্যবয়সী আফ্রিকান-আমেরিকান ভদ্রমহিলা বসে আছেন, একমাথা চুলে জটা পাকানো। সেদিন অবশ্য মিস শ্যাদ্রা পল সাহায্য যথেষ্টই করেছিলেন। একজন নবাগত বিদেশী ছাত্রের গোবেচারী মুখ দেখে করুণা হয়েছিল বোধহয়।

পল বলতে মনে পড়ল অন্য দুটো ঘটনার কথা। বিয়ের পর মেয়েদের পদবী পরিবর্তনের ফল কখনো কখনো কিরকম মজার হতে পারে, তারই উদাহরণ। আমার এক আত্মীয়ের বড়মেয়ের নাম অপালা। এমনিতে সুন্দর নাম, কিন্তু ঘটনাক্রমে কলেজে পড়ার সময় ও যার প্রেমে পড়ল, তার পদবী পাল। নামের বাছবিচার করে তো আর লোকে প্রেমে পড়ে না -- অতএব কিছু করার নেই। বিয়ের পর ওর সমবয়সীরা ওকে ঠাট্টা করে 'জোড়া আপেল' বলে ডাকত। কলেজে আমার কয়েক বছরের জুনিয়র ছিল সাহানা বলে একটি মেয়ে। তারও ওই দশা। লালিত্য আর মেধার গুণে তার প্রণয়প্রার্থীর সংখ্যা কম ছিল না। কিন্তু শেষ অবধি সে যাকে বাছল, হবি তো হ তার পদবী সাহা। ঈশ্বর বলে যদি কেউ মাথার ওপর থেকে থাকেন, তিনি কম রসিক নন! যাইহোক, ও আর ওর ফিয়াসে -- দুজনেই উচ্চশিক্ষার্থে বিদেশে আসার পর ওদের বিয়ে হয় বলে পদবী খোয়ানোর ব্যাপারটা এড়াতে পেরেছিল ও। এখনো নিজের জন্মগত পদবীই ব্যবহার করে। না করলে ওর নামটা কিঞ্চিৎ হাসির খোরাকই হতো - - যেন মনঃস্থির করতে পারছে না ও সাহা না সাহা নয়। আমেরিকানদের মধ্যেও মাঝে মাঝে এ জিনিস ঘটে। আমি এখনকার যে ইউনিভার্সিটিতে প্রথম অধ্যাপনা করি সেখানে Tabitha Macmillan নামে একটি স্নাতকোত্তর ছাত্রী ছিল। সবাই ওকে সংক্ষেপে ডাকতো ট্যাভ বলে। ও পড়াশোনা শেষ করে চলে যাবার অনেক বছর পরে এক কনফারেন্সে ওর সঙ্গে দেখা হতেই নজর করলাম গলায় ঝোলানো পরিচয়পত্রে লেখা Tabitha Lloyd। জিজ্ঞেস করে জানলাম বছরখানেক হলো বিয়ে হয়েছে ওর। বললাম, তাহলে তুমি এখন পুরোদস্তুর ট্যাভলেড হয়ে গেছ? শুনে খুব একচোট হাসলো ও।

এতক্ষণ মানুষের আসল নাম স্মরণীয় হয়ে থাকার কথাই বললাম শুধু। কিন্তু আসল নামের চেয়েও স্মৃতিতে বেশীদিন স্থায়ী হয় লোকজনের দেওয়া মজার মজার ডাকনামগুলো। যেমন আমার বাবার অফিসে উঁচু পোস্টে চাকরি করতেন হিরণ্য সান্যাল বলে এক হুঁপুঁপু, বিশাল চেহারার ভদ্রলোক।

অবস্থাপন্ন পরিবার তাঁদের, থাকতেন কাশীপুরে একটা বড় বাড়ীতে। তাঁর ছেলে আমারই বয়সী, তবে প্রাচুর্যের মধ্যে মানুষ হয়েছে বলেই হোক অথবা অন্য কোনো কারণে, তার ভাবভঙ্গী ছিল একটু আল্লাদী আল্লাদী। ফলে অফিসের সহকর্মীরা আড়ালে তাঁকে বলতেন 'হিরণ্যকশিপুর' আর তাঁর ছেলেকে 'প্রহ্লাদ'। এই ডাকনামটার জন্যই কিন্তু ভদ্রলোকের আসল নামটা আমার এখনো মনে আছে। আর ওঁর ছেলের শুধু ডাকনামটাই বেঁচে আছে, ভালো নাম বিস্মৃতির অতলে। আমার ছোটবেলা কেটেছিল পূর্ব কলকাতার এক কেন্দ্রীয় সরকারী আবাসনে। সেখানে আমাদের পাড়াপ্রতিবেশীদের মধ্যে দুজন সম্পূর্ণ বিপরীত চেহারার ভদ্রলোকের ছিল একই নাম -- প্রশান্ত পাল। একজনের গাট্টাগোটা ভারী শরীর, আর একজন লিকলিকে লম্বাটে। পাড়ার রসিক ছেলেছোকরারা এ সুযোগ ছাড়বে কেন? তারা প্রথমজনকে বলতো পালায়ান (পাল-ওয়ান) আর দ্বিতীয়জনকে পাল-টু। এই দ্বিতীয় ভদ্রলোকের ছেলের ডাকনাম সত্যিসত্যিই লাগু হওয়ায় মজাটা দ্বিগুণ হতো। তবে আসল রগড় পালায়ানবাবুর ছোটো ছেলেটাকে নিয়ে। সে ছিল ভীষণ কাঁদুনে আর জেদী। তার বায়নার চিল-চীৎকার আশপাশের ফ্ল্যাট থেকেও শোনা যেত। তখন আমি বইয়ের পোকা, উপেন্দ্রকিশোরের ছোটদের মহাভারত সবে শেষ করেছি। চরিত্রগুলোর নাম ঠোঁটের ডগায়া হঠাৎ মাথায় এলো, আচ্ছা, ওর নাম 'জেদী-রাজ শিশু-পাল' দিলে কেমন হয়? ব্যস, বন্ধুমহলে বলতেই নামটা জনপ্রিয় হয়ে গেল। এবং দেখাই যাচ্ছে এখনও মনে আছে। তৎকালীন বাংলা চলচ্চিত্রের দুই সত্য বন্দ্যোপাধ্যায়কে ভোলেননি নিশ্চয়ই? সত্যজিৎ রায়ের বেশ কয়েকটি ছবিতে তাঁরা পার্শ্বচরিত্রে ছিলেন। একজনের বেশ মোটা মোটা চেহারা, অন্যজন প্রায় তাঁর আদ্যেক। ছোটবেলায় শুনতাম বাতীর বড়রা হালকা কথোপকথনে এঁদের যথাক্রমে পূর্ণসত্য আর অর্ধসত্য বলতেন। যাইহোক, ওই সরকারী আবাসনে আমি ছিলাম আমার হায়ার সেকেন্ডারী পরীক্ষা অবধি। ততদিনে আমার পাড়াতেতো বন্ধু আর স্কুলের বন্ধুদের অনেকেই তামাক সেবনের 'উপকারিতা' বুঝে ফেলেছে, পকেটে চারমিনার বা উইলস ফ্লেক নিয়ে ঘোরে। এর মধ্যে পাড়ার একটি ছেলের নেশার মাত্রা ছিল একটু বেশীকম। হয়তো পাড়ার মাঠে ক্রিকেট খেলা হচ্ছে, ফিল্ডিং করতে করতে মাঝেমাঝেই বাউন্ডারী লাইনের বাইরে গিয়ে খানিক ধোঁয়া টেনে আসতো ও। তখন সহ-খেলোয়াড়রা ডাকাডাকি করলে বলত, "আরে দাঁড়া না, একটু রি-জুভেনেটেড হয়ে নি, দম পাবা।" এইভাবে একদিন আমাদের মুখে মুখে ওর নাম হয়ে গেল 'ঋজু'। এই ঋজুর বাবা মনোরঞ্জন-মেসো ছিলেন খুব আমুদে আর রসিক। বাড়ীতে যতক্ষণ থাকতেন, গাছপালা আর বাগান নিয়েই সময় কাটতো। ওঁর দোতলার ফ্ল্যাটের ঐটুকু বারান্দায় ফুল আর ফলের এমন বাগান করেছিলেন যে সারা পাড়ার লোক ওঁর কাছে চারাগাছ নিতে আসতো টবে লাগাবে বলে। আর একটা জিনিস ছিল তাঁর অতি প্রিয় -- শিবরাম চক্কোত্তির মতো কথা নিয়ে খেলা। ওঁর স্ত্রীর নাম আসলে সীমা, কিন্তু উনি পাড়ার কচিকাঁচাদের শেখাতেন ঋজুর মাকে 'উল্টোমাসী' বলে ডাকতো। আমরা অনেকে তাই করতামও -- ব্যাপারটা না বুঝেই। মাসীমা এই অদ্ভুত নামকরণের কারণ জিজ্ঞেস করলে উনি বলতেন, "আরে, সীমামাসী বলে ডাকলে আর মজাটা রইলো কোথায়? সীমামাসী উল্টোলেও তো সীমামাসী।"

স্কুলে আমাদের ক্লাসে পাঁচজন ইন্দ্রনীল ছিল। মুখার্জী, ব্যানার্জী, ভাদুড়ী, চৌধুরী আর পালিত। আমরা ওদের বলতাম পঞ্চপালুবা। কিন্তু আমাদের এক অংকের মাস্টারমশাই ওদের ডাকতেন একেন্দ্র, দুয়েন্দ্র, তিনেন্দ্র ইত্যাদি বলে। তবে ইতিহাসের এক প্রৌঢ় শিক্ষক ছিলেন যাঁর আবার অভ্যেস নামের শেষে 'ইন' বা 'এন' থাকলেই সেটাকে 'ইন্দ্রনাথ' বানিয়ে দেওয়া। যেমন সত্যেনকে সত্যেন্দ্রনাথ, রমেনকে রমেন্দ্রনাথ, নীতীনকে নীতীন্দ্রনাথ। পড়া ধরা বা রোলকলের সময় তিনি ঐভাবেই বলতেন নামগুলো। তাই আমরাও নিজেদের মধ্যে ওঁর নাম দিয়েছিলাম 'ইন্দ্রবাবু'। অবশ্য এর ফল ভুগতে হয়েছিল একবার একজনকে। অফ পিরিয়ডে টিচার্সরুমে ওই ইতিহাসের মাস্টারমশাইয়ের সঙ্গে দেখা করতে গিয়ে সেই ঘরের বাইরে টুলে বসা আমাদের স্কুলের পিওন নিখিলদাকে যেই মুখ ফস্কে বলেছে, "আমি ইন্দ্রবাবুর সঙ্গে দেখা করতে চাই", (তখন সেইরকমই নিয়ম ছিল -- সরাসরি টিচার্সরুমে ঢুকে পড়তে পারতাম না আমরা, দরজায় বসা শিক্ষাকর্মীদের মাধ্যমে ওঁদের ডেকে আনতে হতো ভেতর থেকে), নিখিলদা অমনি বাংলার শিক্ষক রাগী-রাগী চেহারার নারায়ণবাবুকে ডেকে এনেছে, কারণ ওঁর আসল পদবী ইন্দ্র। যাইহোক, এঁরা ছাড়াও আরও কিছু মাস্টারমশাইয়ের ছাত্রমহলে প্রচলিত নামের কথা স্পষ্ট মনে আছে। যেমন, আমাদের দুজন শিক্ষকের নামের আদ্যক্ষর ছিল জি বি (গৌরঙ্গ ব্যানার্জী আর গৌতম বসু)। একজন খুব লম্বা আর অন্যজন ক্ষীণকায় ও খর্বকায়। স্বাভাবিকভাবেই আমাদের কাছে ওঁরা ছিলেন 'দীর্ঘজীবী' আর 'ক্ষীণজীবী'। আর একজন ইংরেজীর শিক্ষক আমাদের ইংরেজীতে কথোপকথনে চোস্ত করার জন্য আগাগোড়া ওই ভাষাতেই কথা বলতেন। ক্লাসে তাঁর হাবভাব আর চালচলনে কেমন যেন একটু বিলিতি-বিলিতি গন্ধ ছিল। রোলকলের সময় খাঁটি সাহেবী কায়দায় ওপরের ঠোঁট না কাঁপিয়ে ঠোঁটের কোণ দিয়ে বলতেন "রেসপন্ড"। ক্লাসের কিছু ফিচেল ছেলে তার সঙ্গে ছন্দ মিলিয়ে ওঁকে ডাকতো 'জেমস বন্ড'। সেই পৃথিবীবিখ্যাত গুপ্তচরের বহুলপরিচিত নম্বর যেহেতু ০০৭, তাই শেষ অবধি ওই ০০৭-ই হয়ে গিয়েছিল তাঁর ডাকনাম।

ডাকনাম নিয়ে এমনতরো রসবোধ আমরা, মানে মার্কিনমূল্যে উচ্চশিক্ষার্থে আসা আমি ও আমার চেনাশোনা বাঙালী ছেলেমেয়েরা, ধরে রেখেছিলাম আমাদের স্নাতকোত্তর আর ডক্টরেট পর্যায়েও। আমি ছাত্রাবস্থায় যে ইউনিভার্সিটিতে ছিলাম, তার পরিসংখ্যান বিভাগে অধ্যাপক ডেভিড ডাল-এর তত্ত্বাবধানে গবেষণা করতো মাইক পোস্টেন নামে এক আমেরিকান আর রঘুরাম ভাট নামে এক ভারতীয়। ওঁদের যৌথভাবে লেখা গবেষণাপত্রগুলোকে আমরা বলতাম 'ডাল, পোস্ট আর ভাট'। ওই ইউনিভার্সিটিরই গণিত বিভাগে গবেষণারত দুই হাঙ্গেরিয়ান ছাত্র Shandor আর Gabor আমাদের বিভাগ থেকেও কয়েকটা ক্লাস নিতে আসতো। সবসময় একসঙ্গে ঘুরত ওরা, একসঙ্গেই খাওয়াদাওয়া করতো, ক্লাসে পাশাপাশি বসত। যাকে বলে একেবারে অবিচ্ছেদ্য বন্ধু। আমার এক বাঙালী সহপাঠীর উর্বর মস্তিষ্ক ওদের ডাকনামদুটোও করে দিয়েছিল অবিচ্ছেদ্য। সে ওদের আড়ালে ডাকতো 'সাঁড়ের গোবর' বলে। সেই ছেলেটির নিজের গবেষণা যাঁর তত্ত্বাবধানে, তাঁকেও সে রেহাই দেয়নি মজার ডাকনাম থেকে। ভদ্রলোকের আসল নাম Kenyon C. Garreth তাঁর রসিক ছাত্রের হাতে পড়ে হয়ে দাঁড়িয়েছিল 'কিনে আন সিগারেট'। এ দেশের বিখ্যাত জামাকাপড়ের দোকান জে সি পেনিকে যে বানিয়ে দিয়েছিল জগদীশ চন্দ্র পেনি, তার কাছে এর কম আর কী আশা করা যায়?

তাহলে মোদ্দা কথা দাঁড়ালো কী? নাম জিনিসটা নামের অধিকারীর গুণে যেমন অমরত্ব পায়, তেমনি নিজগুণেও অক্ষয় হয়ে থাকে অনেকক্ষেত্রেই। অতএব বলুন -- পৃথিবীতে স্থায়ী চিহ্ন এঁকে রেখে যেতে চান? কোনো দরকার নেই বোকার মতো খেটেখুটে ঘাম-রক্ত বরিয়ে বিখ্যাত হবার। বা কারো হৃদয়ে নাম লেখার আশায় প্রেম নামক কাঁঠালের আঠায় আটকা পড়ে খামোখা দুর্ভোগ পোয়ানোর। শুধু একটু মাথা খাটিয়ে বেশ জম্পেশ, সুড়সুড়ি দিয়ে হাসানোর মতো, কটেক্স আর সেরিবেলাম -- দুটোতেই একসঙ্গে গেঁথে যাওয়ার মতো একটা নাম বেছে নিন। তাহলেই কেবলা ফতো। যেমন ধরুন এই লেখাটাই যদি সুজয় দত্তের না হয়ে 'জুতানন্দ বিন্দুপদাঙ্গুলি' বা ঐরকম কোনো জমকালো নামওয়াল লোকের হতো, আরো অনেক বেশীদিন স্মৃতিতে উজ্জ্বল হয়ে থাকতো না লেখকের নামটা?

অবশ্য এক অর্থে এটা জুতানন্দ বিন্দুপদাঙ্গুলিরই লেখা। কারণ জুতা = Shoe, আনন্দ = Joy, বিন্দু = Dot আর পদাঙ্গুলি = Toe.



শব্দস্বস্তিকা উত্তর:

পাশাপাশি: ১. আজি ৩. চপল ৫. তটিনী ৭. চাবি ৮. বিবর ৯. চাষা ১০. গরজ ১২. রতন ১৪. কোজাগরী ১৭. লোপ ১৮. রম্যাণি ২০. পাল
২১. মেয়াদ ২২. জপ ২৩. মিনতি ২৪. আলায় ২৬. উট ২৭. রবাহূত ৩২. তান ৩৩. বিটপী
৩৪. কপোল ৩৫. নটী ৩৬. বজরা

উপরনীচ: ২. জিজীবিষা ৪. পটুবন্দ্র ৬. টিনের তলোয়ার ৭. চাচা ১০. গর ১১. জনপদ ১৩. বরজ ১৫. জাপান
১৬. গলতি ১৯. ম্যাপ ২১. মেঘ ২৩. মিশর ২৫. তাঁত ২৬. উদ্দালক ২৮. বাতায়ন ২৯. হূণ ৩০. নটরাজ ৩১. বঙ্কল

“বরষ ধৰা মাঝে শান্তিৰ বারি”

সকলকে আমাদেৰ শুভেচ্ছা জানাই



**Nitis, Chandana, Richik, Andrea,
Prateek Sarkar , Adrienne Day,
Diyamoni Sarkar, Harry and Otis**

সকলকে শারদীয় শুভেচ্ছা জানাই

নবীন সাহানা শ্ৰীদীপ মেলনী নীলাঞ্জন

অৰ্জুন ও মায়

শারদোৎসবের শুভেচ্ছাসহ



তৃণা, এ্যালিসা, প্রান্তিক, সমীরা

গোপাল ও শিপ্রা সাহা

The Blue Diamonds Mystery

Rajonya Pramanik (6th Grade)

OLD ENGLAND

Mrs. Ethna Mozorin was one of the best story tellers in the world. She always told fairy stories to her two daughters. She lived with her 2 daughters Elny and Chrisa in the most beautiful house on 47th Bolty Lane Street. Her 2 daughters Christolina and Elniberta were always fond of her detective stories. They would, at night, always be eagerly waiting for hearing a new amazingly awesome detective story from their mother.

They lived in England. England was always covered by thick clouds or low sun. The raindrops would run down the window pane and make rainy sounds. Elny liked the sound very much; she would sit near the window for long hours and hear the sounds or paint beautiful sceneries of rains and rainy areas.

Ethna worked at a photo studio. She never really liked her job but still had to do one to afford her daughters' school and family expenses. She hated her job so much that once she had tried to quit but then remembered the laughing faces of her daughters. The mother of all problems was her boss Mrs. Andoline Manhattan, whom she hated to say the truth, but her older daughter Chrisa had made her learn something.

“Never hate people, try to improve them, because you hate them as you don't like their habits and manners.”

From that day she had never hated Mrs. Andoline, she tried to improve her habits. She told her the things she didn't like of her and they naturally improved a happy and beautiful relationship. Generally, this doesn't happen between a boss and a worker but it did. Mrs. Andoline was a woman of sweet nature, though she had some unsweet manners.

Chrisa was a girl with gold locks of hair sticking all over her dress and burning red cheeks, whenever she smiled there was a beautiful feel of happiness. She was a good-natured girl, she had always been one. She was a homely girl and would help Ethna with household chores and go to the garden and take care of it. She very much liked the garden where there were many flowers and her favorite pet Sana. Sana was a pet cat and was very much liked by Christolina and the other members of the family. Ethna had been living in that lovely house on 47th Bolty Lane Street for 16 years. 16 years ago, her grandfather named the house after her. The house was actually 94 years old. Many of Ethna's ancestors had lived in there. Though it didn't look that old as it had been well maintained for years.

Ethna had a habit of going to her aunt's house very often after her aunt Celia's death. Every summer holiday she would go to Celly's house and spend at least a week there.

The house was named after Ethna's aunt Celia; it was called The Celia Mansion.

The house had beautiful gardens all around it. The house's caretaker Mr. Dane Edison was fond of the house, so he still stayed in the house after her aunt's death in spite of the fact that in her will Mrs. Celia wrote that he could abandon the house after her death.

There were many different kinds of flowers like marigolds, daffodils, roses and lilies. Mr. Edison also took care of the garden. The garden was the most precious part of the house; it was so beautiful that any kid who saw it was so pleased that he or she didn't want to leave.

There were many birds like robins, parrots, pigeons and many others. Elniberta named the robin (she thought was a girl) Jona. Jona was a beautiful red breasted bird. "I love you Jona, you have such sweet feathers and a beautiful sharp beak, you're the sweetest bird I've ever seen." Jona stared at her as if she understood what Elniberta was saying. Ethna and her daughters really enjoyed living in old England.

THE NEWS

"We have to leave for India in a couple of weeks." Ethna said at the dinner table changing the mood of her daughters completely.

"What! Why?" Elniberta asked with many curves on her forehead and eyebrows raised at the top, giving her face a doubtful expression.

"We...I...I have an aunt in India, Aunt Sonia...she is aunt Celia's sister," Ethna sighed "She is a journalist and for the last couple of years she was in India writing about its environment and stuff, she bought an house there and in her will she named the house after me...she said it was mine after she died and she...wanted me to stay there after her death and she..."

"She died a couple of days back?" Interrupted Christolina with big, round, questioning eyes.

"Yes, well she is the owner of 8 very expensive blue diamonds, worth \$60,000, it has been protected by our family for a very long period of time."

Both girls left their forks and kept staring with an open mouth. There was silence and surprised stares for a while. Then finally one of the girls said, breaking the silence "\$60,000; big amount. But it is sad to leave our own homeland."

"I know, but: come on girls it will be a different experience and you'll not go to school there. Schools are completely different, there are many rules: I'll be homeschooling you girls."

This relieved both of them; they can't take so many changes together. Though it was sad to go to a completely different country, they looked at the brighter side: it was a different experience. And it would be great to be the proud owners of the blue diamonds.

"When are we leaving?" Asked Elny leaving that big bunch of amazement and surprise behind.

"Couple of weeks..." Said Ethna.

Everybody at school came to know about the news pretty soon. After all, Christolina was a media reporter at school as everyone called her at school because she can't hold exciting news in her mouth for a long time.

Soon they started packing their bags for the India Experience.

IN THE SHANTYTOWN

Very soon after the plane landed on the Mumbai airport, the Mozorins were in the other side of the wall, the shantytown. The airport was as crowded as thousands of people together. Both the girls thought "Aunt Sonia, lived here in this super polluted jungle of billions of humans and dirt." The air was highly polluted and there was chaos all the time, people jammed the road with four times the no. of cars in a U.S road at a time. There were sounds of people arguing with the taxi managers. There was dirt everywhere opposite to their country.

“I can’t stay here.” said Elny all red with anger and disgust.

“Me too.” Added Chrisa.

“I know but look at the hundreds of people who are begging for money and trying to survive, we are so lucky, don’t you think so?”

This calmed both. This was really something they had not thought of. They saw a person with a bowl in hand asking for money in a different language though. They gave him 2 Indian coins and said “What is he speaking?” Ethna said it was Marathi, the local language of Mumbai. They also spoke Hindi; there were many languages in India.

After that, they saw a red car waiting for them, the driver wore a white thing which their mom called was Dhoti. They went through the dry, chaos and dirty road and stopped in front of a big house. It was as royal as a palace. Servants greeted them by saying “Namaste” or “Namaskar” joining their hands together. One of the servants, Mr. Surinder knew English and translated whatever the others said.

“Where are the diamonds?” asked Chrisa, Ethna told her to calm down and talk softly.

MISSING DIAMONDS

“They are in the other room.” Said Surinder. He showed them the diamonds, they were so beautiful. There were beautiful trees though not as beautiful as in the U.S and a lush green garden. Birds flying over, they thought it was quite a good thing or not as bad as expected to be in India.

There were plenty of servants in the house. Mr. Sahib was an old servant and he was very nice. Mr. Surinder was very well behaved. Other than them there were Asana, Basanti and a few others. Asana was the wife of Mr. Sahib.

Until one day when the murder of Sahib was cracked out and the diamonds were gone. Everyone was shocked. The policeman started the investigation. One day when the Mozorins were returning from the bazaar with Asana, a guy pushed them and also said sorry, funny incidence they thought. When they were home Elny found a note in her pocket saying **GET OUT OF Mumbai, RIGHT NOW!! DANGER!** Most possibly it was the killer who wrote this note as a warning. Not at all funny!

THE CONCLUSION

Ever since getting that note in Elny’s pocket, Chrisa tried to be a detective and told everyone, she wanted to find the killer. The most supporting person in her quest was Surinder. However, one-night Chrisa woke up to get some water when she heard a vase fall. She quickly went upstairs and found Mr. Surinder killing one of the servants Asana. He had a gun in his hand pointing to Chrisa and said. “I told you to get out.” Elny was a black belt in karate - so she quickly tricked Surinder and took the gun. She was shocked at the scene of the others’ dead bodies lying on the floor and blood all around. “I’ll not kill, I’ll punish you. Well I didn’t expect you to be the one.” Soon Ethna came hearing the commotion and said “ Found the killer and stealer, well done.”

Surinder was jailed after that and he said he killed Sahib and the others because…well quite clear, isn’t it? As they found out his plans of stealing diamonds.



শারদীয় অভিনয়



Mrinal  Anjali
Anjan & Monica, Reema & Ria



সুরের গুরু

অমিয় ব্যানার্জি

কলকাতার অনেক গানের আসরে জর্জদার গান মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে শুনলেও, তাঁর সঙ্গে সরাসরি প্রথম সাক্ষাৎ হয়েছিল এক অবিস্মরণীয় অনুষ্ঠানের মাধ্যমে। সেটা ১৯৫৪ সাল, আমি প্রেসিডেন্সী কলেজের চতুর্থ বর্ষের ছাত্র, প্রবল উৎসাহে আমরা সে বছর "বর্ষামঙ্গল" মঞ্চস্থ করব বলে মনস্থ করলাম। প্রধান উদ্যোক্তা, আমাদের ছাত্র সম্পাদক, সহপাঠী বন্ধুবর জ্যোতির্ময় পালচৌধুরীর নেতৃত্বে আমরা সকলে মিলে ঠিক করলাম জর্জদা, সুচিত্রা মিত্র প্রমুখ প্রখ্যাত রবীন্দ্রসঙ্গীত শিল্পী ও কলেজের ছাত্র-ছাত্রীদের নিয়ে এই গানের আসরটিকে এক নতুন মাত্রা দেব। অনেক কাঠখড় পুড়িয়ে উদ্যোক্তারা শেষ পর্যন্ত জর্জদা ও সুচিত্রা মিত্রকে রাজি করালো, আর তার সঙ্গে সংলাপে অংশগ্রহণে সম্মতি দিলেন প্রখ্যাত অভিনেতা শম্ভু মিত্র। আমার উপর ভার পড়েছিল একটি একক সঙ্গীত গাইবার- "আঁধার অন্ধরে প্রচণ্ড ডম্বর..."। কিন্তু এমনই ভাগ্য, সেটা গাইতে হবে জর্জদার গান আর সুচিত্রা মিত্রের গানের মাঝখানে। সংকলক, সহপাঠী বন্ধুবর শিশির দাসকে অনেক অনুরোধ করা সত্ত্বেও বদলানো গেল না। আমার তো প্রায় "ছেড়ে দে মা কেঁদে বাঁচি" অবস্থা। এখনো মনে আছে, জর্জদার গান, "কোথাও যে উধাও ..." শেষ হবার পর কিছু সংলাপ ছিল, তারপরে আমার গান। জর্জদা আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, "হারমোনিয়ামটা আমিই বাজিয়ে দিই।" সেকথা কিন্তু আগে ঠিক ছিল না, সহপাঠী বন্ধুবর জ্ঞানব্রত ভট্টাচার্যের বাজাবার কথা ছিল। প্রচণ্ড নার্ভাস হয়ে একেবারে কাঠ হয়ে গেলাম। সংলাপ শেষে গান শুরু করলাম, সঙ্গে সঙ্গে জর্জদার হারমোনিয়াম বেজে উঠল। কীভাবে যে গানটা শেষ করেছিলাম জানিনা, তবে গানের শেষে জর্জদার সেই আশ্বাসপূর্ণ চাহনিটা আজও স্পষ্ট মনে আছে। সেদিনের অনুষ্ঠানে আমরা যেসব ছাত্র-ছাত্রীরা অংশ নিয়েছিলাম, সময়ের প্রবাহে তাদের সবার মুখেই আজ বয়সের ছাপ পড়েছে, কিন্তু মনের গভীরে সেই দিনটার স্মৃতি আজও এক উজ্জ্বল জ্যোতিষ্কের মত অনিবার্ণ রয়েছে। সেই এক অভূতপূর্ব পরিস্থিতিতে জর্জদার সঙ্গে আমার প্রথম পরিচয়। সেই অনুষ্ঠানের মাধ্যমে শুরু হল তাঁর সঙ্গে আমার দীর্ঘ ২৫ বছরের অন্তরঙ্গতা, যা আমার চেতনার মধ্যে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে আছে এক অমূল্য অনুভূতিতে। তাঁর আন্তরিক সান্নিধ্য ও ভালবাসা আমার জীবনে ঈশ্বরের এক পরম আশীর্বাদ।

সে বছরেই ঠিক করলাম জর্জদার গানের ক্লাসে যোগ দেব। ছোটবেলায় আমার গান শেখার শুরু হয় মা'র কাছে রবীন্দ্রসঙ্গীতের তালিম নিয়ে। কৈশোরে ও যৌবনের শুরুতে স্কুল ও কলেজের নানা অনুষ্ঠানে গান গেয়ে কিছুটা স্বীকৃতি মিলেছিল। এরপর প্রেসিডেন্সীর "বর্ষামঙ্গল" অনুষ্ঠানের দারুণ সাফল্যের পর বেশ কিছু বন্ধুবান্ধবের পীড়াপীড়িতে ঠিক করলাম গানের জগতে এবার একটু থিতু হতে হবে, তাই গানটা ভাল করে শিখতেই হবে। তখন রবিবার সকাল দশটায় জর্জদার বাড়িতে গানের ক্লাস হতো। তার পরে ও আগে বিশেষ ক্লাস হতো একেকজনকে নিয়ে। আমি ঐ দশটার ক্লাসে গিয়ে হাজির হলাম; আমাকে দেখে জর্জদা চিনতে পেরে বললেন, "কী গান শিখবা নাকি? বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃতি ছাত্রদের গান শিখিয়া লাভ কী? তামরা তো উচ্চ সরকারী কামের লইগ্যা IAS পরীক্ষা দিবা। গান গাইয়া কী হইব?" আমি কোন অভিযোগ না করে বললাম, "আপনার কাছে গান শেখার সুযোগ পেলে কৃতার্থ মনে করবা।" "তাইলে আর কী, বইস্যা পড়ো", জর্জদা তাঁর স্বভাবসিদ্ধ হাসি হেসে বললেন।

আজও মনে আছে সেদিনের গান- "কুসুমে কুসুমে চরণ চিহ্ন..."। তাঁর সেই উদাত্ত কণ্ঠে শুনলাম ও শিখলাম। এখনও কোথাও এই গানটা গাইলে সেদিনের কথা মনে পড়ে এক অদ্ভুত রোমাঞ্চ হয়। যতদূর মনে পড়ে আমাদের সেই ক্লাসে তখন যাঁরা ছিলেন তাঁরা হলেন, আমার বন্ধুবর জ্ঞানব্রত ভট্টাচার্য, অর্ধ্য সেন, অরবিন্দ চক্রবর্তী, আশিস পালিত, ডলা সরস্বতী, লামা মুখার্জী, বুদ্ধদেব গুহ প্রমুখ। জর্জদার মাসিক দক্ষিণা ছিল মাত্র পাঁচ টাকা। মাসের শেষে আমরা তাঁর পায়ের কাছে টাকাগুলি রেখে দিতাম, উনি ভুলেও দেখতেন না, কে দিল আর কে দিল না। এইভাবেই তিনি ক্লাস চালাতেন। জর্জদা চাইতেন না যে আমরা গীতবিতান দেখে গান গাই- উনি নিজেও কখনো তা করতেন না। কোন অনুষ্ঠানেই তাঁর সঙ্গে গীতবিতান বা অন্য কোন কাগজপত্র থাকত না, থাকত শুধু তাঁর হারমোনিয়াম। আমাদের কিন্তু বিপদ হলো যে এক সপ্তাহের মধ্যে নতুন গান শিখে, ভালভাবে প্র্যাকটিস করে, তার উপর পুরো মুখস্থ করে পরের রবিবার ক্লাসে আসতে হবে। বহু ছাত্র-ছাত্রী গাইতে গাইতে অনেকবার লজ্জিত হয়েছে ভুল কথা উচ্চারণ করে। এরকমই একটা ঘটনা আমার মনে পড়ছে। অনেক চেষ্টা চরিত্র করে এক সপ্তাহ ধরে "কেন সারাদিন ধীরে ধীরে..." গানটি মুখস্থ করে, বহুবার প্র্যাকটিস করে রবিবার হাজির হলাম জর্জদার ক্লাসে। কয়েকজন গাইবার পর এল আমার পালা। গভীর আত্মবিশ্বাস নিয়ে গাইতে শুরু করলাম জর্জদার হারমোনিয়ামের সঙ্গে। ভাললাম খুব দরদ দিয়ে গাই, আর সেটা করতে গিয়ে "হেসে কেঁদে চল..." ভুলে গিয়ে গাইলাম, "কেঁদে হেসে চল..." জর্জদা তক্ষুনি হারমোনিয়াম থামিয়ে বলে উঠলেন, "আহা-হা রে, কেঁদে হেসে, মনে হয় গুরুদেব ভুলই লিখসেন। তোমার দরদের তুলনা নাই।" সকলে হো হো করে হেসে উঠল আর আমার লজ্জায় মুখ লুকোনোর জায়গা রইল না।

কিছুদিন তাঁর বাড়িতে যাতায়াতের পর জর্জদা আমাকে একটু বেশী কাছের মানুষ ভাবে শুরু করলেন। এটা কিন্তু আমার গান বা গায়কীকে পছন্দ করে নয়। আসলে তিনি ততদিনে জানতে পেরেছেন, যে আমার মামাবাড়ির সকলেই ব্রাহ্ম। তিনি হয়ত ব্রাহ্ম সমাজের মাধ্যমে আমার সঙ্গে নিজের

একটা অদৃশ্য যোগসূত্রের সন্ধান পেয়েছিলেন। আমার মামা ডা: শরদিন্দু ঘোষালকে (পাটনার সুপ্রতিষ্ঠিত ডাক্তার ছিলেন) জর্জদা খুব ভালভাবে চিনতেন ও শ্রদ্ধা করতেন। আমার ছোট মামীমা মালতি ঘোষালকেও তিনি খুবই সম্মান করতেন। ভবানীপুর ব্রাহ্ম সমাজের আচার্য শ্রী সুধীর চট্টোপাধ্যায় ছিলেন আমার দিদির শ্বশুর। তাঁর আমন্ত্রণে জর্জদা অনেকবার মাঘোৎসবে গান গেয়েছেন। আমিও তাঁর সঙ্গে যোগ দিয়েছি কয়েকবার। তাই নিভূতে যখন জর্জদার সঙ্গে বসে আড্ডা দিয়েছি, তখন তাঁকে বলতে শুনেছি, "জানো রবীন্দ্রসঙ্গীত সকলের গলায় হয় না। তাঁর গান গাইতে গেলে উপলব্ধি থাকা দরকার, অন্তর দিয়ে ভালবাসা দরকার। ব্রাহ্ম না হইলে তাঁর গান গাওয়া মুশকিল।" হয়ত আমার মধ্যে জর্জদা সেই আভাস কিছু পেয়েছিলেন। এই প্রসঙ্গে মনে পড়ে (বছরটা মনে নেই), কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থবিজ্ঞানের স্বনামধন্য অধ্যাপক ড: শিশির মিত্রের সন্তানের বিদেশে এক দুর্ঘটনায় অকালে মৃত্যু হওয়ার পর ড: মিত্রের ব্রাহ্ম পরিবার জর্জদাকে, খুব ভালভাবে চিনতেন বলে, শ্রাদ্ধবাসরে গান গাওয়ার জন্য অনুরোধ করেন। জর্জদা পড়লেন এক মহা সঙ্কটে; না পারছেন ড: মিত্রের অনুরোধ উপেক্ষা করতে, আর না পারছেন গান গাওয়ার সম্মতি দিতে। কারণ তিনি শ্রাদ্ধ বাড়িতে জীবনে কখনো, কোনোদিন, কোন জায়গায় গান করেননি। অথচ ড: মিত্রের অনুরোধই বা ফেরাবেন কি করে! অনেক ভেবে শেষে ঠিক করলেন আমাকে দিয়ে গানগুলি গাওয়াবেন, কারণ আমি তখন ব্রাহ্ম পরিবারের অনেক অনুষ্ঠান, বিবাহ বা শ্রাদ্ধবাসরে উপাসনার সঙ্গে গান করছিলাম। ড: মিত্র ও তাঁর পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে কথা বলে জর্জদা ব্যাপারটা অনুমোদন করিয়ে নিয়েছিলেন। আমার বোন অঞ্জলীকে আমার সঙ্গে কিছু "ডুয়েট" করতে বলেছিলেন। আমরা ওনার বাড়িতে বসে কী কী গান গাইব তার তালিম নিয়েছিলাম। সেই শ্রাদ্ধবাসরে আমরা যখন গাইলাম, জর্জদা তখন দর্শকাসনে। আমার উপর ওনার আস্থা এবং গভীর মেহ এই ঘটনার মাধ্যমে প্রকাশিত হয়েছিল। এই ঘটনাটি আমার মনে গভীর রেখাপাত করেছিল এবং আমার মনের শ্রদ্ধার আসনে ওনার অবস্থান আরও সুদৃঢ় হয়েছিল।

১৯৬৫ সালে দেশ ছাড়ার আগে পর্যন্ত সুদীর্ঘ ১১ বছর জর্জদার সঙ্গে বিশেষভাবে জড়িত ছিলাম। প্রত্যেক রবিবারেই যে গানের ক্লাসে গিয়েছি তা নয়, বহুসংবাদ পড়ে গেছে পরীক্ষা ও অন্যান্য কারণে যাওয়া হয়নি। কিন্তু যখনই সময় পেতাম রবিবার সকালের ক্লাসে যোগদান করার জন্য মন অধীর হয়ে উঠত। ক্লাসে না যাবার জন্য জর্জদা কখনই রাগ করতেন না। তাঁর স্বভাবসিদ্ধ রসিকতায় বলতেন, "কইসিলাম কিনা, গান শিখ্যা কী হইব? IAS পরীক্ষা দিলা নাকি?" এইভাবে বছরের পর বছর কাটিয়েছি। গান শিখতে না গেলেও জর্জদার বাড়ি- ১৭৪ ই, রাসবিহারী এডিন্‌-টা আমাদের কাছে একটা তীর্থস্থান ছিল। সময় পেলেই তাঁর বাড়িতে গিয়ে উপস্থিত হতাম নির্ভেজাল আড্ডা দেবার জন্য। তাঁর সেই ঘরে যে কত লোক আসত! অবশ্যই সঙ্গীত জগতের লোক, এছাড়াও অচেনা অজানা কত লোক যে আসতেন তার কোন ইয়ত্তা নেই। জর্জদার আতিথেয়তারও তুলনা ছিল না। কেউ আসা মাত্রই বলতেন, "আরে আরে আসুন (বা এসো)। ওনারে বসতে দাও, জায়গা করো।" জায়গার অভাব সব সময়েই বেশ বেশী রকমের ছিল। জর্জদার দুই কাছের লোক শ্রীকান্ত (রামা করত) আর অনন্ত (ফাইফরমাস খাটত)। দুজনকে পুরো নাম ধরে ডাকতে অনেক সময় লাগত বলে উনি ঠিক করলেন চড়ার সা-তে "ত" বললে অনন্ত আসবে আর নীচুর সা-তে "ত" বললে শ্রীকান্ত আসবে। তাই চড়ার "ত" বলে আমরাও ডাকতাম অনন্তকে চা নিয়ে আসার জন্য গলির মোড়ের চাওয়ালার কাছ থেকে। এইরকম আড্ডায় বহু বিখ্যাত লোককে দেখেছি- সাগরদা (সেন), সুবীরদা (সেন), সলিলদা (চৌধুরী), ঋত্বিকদা (ঘটক), মঞ্জুদি (চাকী) প্রমুখ অনেকজনকে। কোথা দিয়ে যে সময় কেটে যেত তার ঠিক ছিল না। জর্জদা প্রত্যেক বছর তাঁর অফিসে (হিন্দুস্থান বিল্ডিং) একটা বিরাট অনুষ্ঠান করতেন। তাতে আমরাও যোগ দিয়েছি। সেই অনুষ্ঠানের বিশেষ আকর্ষণ ছিল জর্জদার গানের সঙ্গে মঞ্জুদির নাচ। সে সত্যিই এক অনবদ্য সৃষ্টি। দর্শকরা আনন্দে ফেটে পড়ত সঙ্গীত ও নৃত্যের এই যুগলবন্দীটি দেখে।

কত ছোট ছোট ঘটনা আজও মনে পড়ে। জর্জদার ভাগ্যে খোকন তাঁর অত্যন্ত স্নেহের পাত্র ছিল। তার হার্টের চিকিৎসার জন্য সে মামার বাড়িতেই থাকত। খোকন একবার জর্জদার কাছে আবদার ধরল টেস্ট ক্রিকেট ম্যাচ দেখতে যাবার জন্য। জর্জদা একটু বিপদে পড়লেন। পাঁচদিনের খেলা, কী করে ব্যাপারটা সামলানো যায়! ডাক পড়ল আমরা। ঠিক হল, জর্জদা আমাদের নিয়ে সকালে ইডেন গার্ডেনসে নামিয়ে দিয়ে আসবেন। তারপর অফিসে হাজিরা দিয়ে ১১-টা নাগাদ মাঠে এসে আমাদের সঙ্গে খেলা দেখবেন। আমার কাছে যেটা খুবই লোভনীয় ছিল তা হলো জর্জদার কৌটো ভরে প্রতিদিন নানান রকমের লাঞ্ছ নিয়ে আসা। বলাই বাহুল্য দেবব্রত বিশ্বাস যখন ১১-টার সময় গ্যালারিতে এসে বসতেন তখন চারিদিকে একটা গুঞ্জন উঠত। "জর্জদা কেমন আছেন?" ইত্যাদি। একদিন লাঞ্ছের সময় জর্জদা যখন কৌটো থেকে আমাদের খাবার বার করছেন, এক দর্শক পিছন থেকে বলে উঠলেন, "আজকে কি আছে জর্জদা?" বিন্দুমাত্র কালক্ষেপ না করে জর্জদা উত্তর দিলেন, "আকাশভরা, খাবেন নাকি?" সারা গ্যালারিতে হাসির রোল উঠল তাঁর এই মন্তব্যে। জর্জদার রসিকতা ছিল "লেজেভারি"। আড্ডার সময়ে উনি একাই আসার জমিয়ে রাখতেন কত গল্প ও তার সঙ্গে রসিকতার ফোড়ন মিশিয়ে।

এদিকে আমি সায়েন্স কলেজ থেকে M.Sc. পাস করার পর বায়োকেমিস্ট্রিতে Ph.D. করে জীবনের এক বিরাট পরীক্ষার সম্মুখীন হলাম। তখন গানের জগতে আমাকে লোকে একটু একটু চিনতে পারছে, খানিকটা সুখ্যাতিও হয়েছে। রেডিওতে গান গাইতে শুরু করেছি। প্রোগ্রামের আগে জর্জদার কাছে তালিম নিতাম সব সময়। ওনার সঙ্গে ইউনিভার্সিটিতেও গান বা নৃত্যনাট্যের অনুষ্ঠানে গান করে বেরিয়েছি। সুতরাং বিজ্ঞান ও গান পুরোদমে চলছিল। এমন সময়ে ১৯৬৫ সালে আমার ও আমার স্ত্রী শিপ্রার কাছে আমেরিকাতে পোস্টডক্টরাল ফেলোশিপ নিয়ে গবেষণা করার সুযোগ এলো। অনেক চিন্তা-ভাবনা করে স্থির করলাম যে আমেরিকাতে বিজ্ঞানচর্চা করতে যাব এবং দুই কি তিন বছর ওখানে থেকে কলকাতায় ফিরে এসে কোন রিসার্চ ইনস্টিটিউশনে যোগ দেব ও আবার নিজেকে গানের জগতে নিমগ্ন করব। আমেরিকা যাবার আগে জর্জদার বাড়িতে প্রণাম করে বিদায় নিতে গেলাম; উনি ঠাট্টা করে বললেন, "বলসিলাম না, গান গাওয়া তোমাগো মুশকিল। অহন বড় বৈজ্ঞানিক হইতে যাও। তবে গানটা ছাইড়ো না।" আজ দীর্ঘ ৫৩ বছর আমেরিকায় কাটাবার পরেও, আমার মনে হয় জর্জদার কথা আমি রেখেছি। এখানে আমি গানও গেয়েছি আবার

মেঘ বন্ধু

নমিতা দাস

(দমদম বিমান বন্দর)

আকাশযানের জানলা খুলে দেখি--

রঙ বেরঙের মেঘেরা সব
যাচ্ছে ভেসে আকাশ পথে।

মনে মনে প্রশ্ন করি--

মেঘ বন্ধু মেঘ বন্ধু

পাশপোর্ট ভিসা লাগে না

তাই ঘুরছো দেশ বিদেশে ?

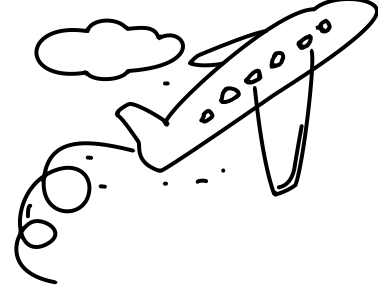
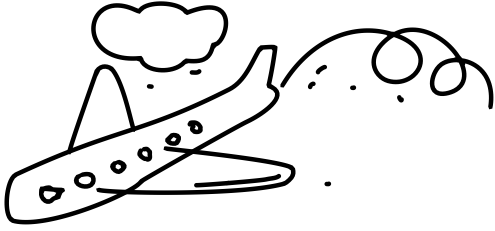
হতাম যদি তোমার মতন মুক্তমনের--

সুদৃঢ় তারকাটার ঐ গন্ডি ভেঙে

ভেসে যেতাম আকাশ পথে--

শৈশবের সেই পূববাঙলার

সুজলা সুফলা সবুজ দেশে।



ফেরার পথে

নমিতা দাস

(দমদম বিমান বন্দর)

ফিরছি মোরা ইন্ডিয়াতে

আদরের দিদু-দাদুভাইকে বিদেশ বিঁুঁই রেখে,

ভাবতে গেলে বুকের ভেতর

ব্যাথায় কনকন করে।

প্লেনের দিকে যাচ্ছি যখন--কেঁদে দিদু বলছে মাকে,

দাদু দিদা যাচ্ছে কেন চলে ?

অশ্রুভরা ভরা চোখে বলছে মেয়ে

ছয়মাসের বেশি থাকলে বিদেশে ,

কপ এসে ধরবে শেষে।

তবুও ছোট্ট দিদু-দাদুভাই

হাত তুলে টা টা বাই বাই করে।

চোখের জলে ঝাপসা হয়ে

হেঁচট খেয়ে পড়ি,

সঙের সাথী বুড়ো আমার

ঝাটতে হাত ধরে।



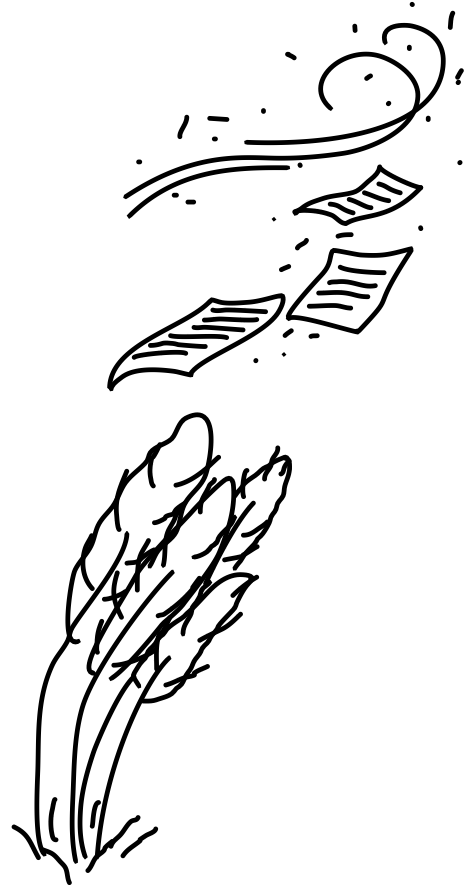
তারপর...

ব্রতী ভট্টাচার্য

মুঠো মুঠো কাশের সাদায়
সবুজ মনের রং দিয়ে
হাওয়ায় হাওয়ায় মেঘলা স্বপ্ন লিখে পাঠাই-
সেই তাকে, যার নাম নীহারিকায় লিখি রোজ।

সেই হাওয়া সিন্ধু পেরিয়ে-
ব্যাবিলন.. গ্রীস... তারপর মিশর....
ঘুরে ঘুরে... ব্যর্থ উড়ে উড়ে,
কোথাও না পেয়ে তাকে, দারুণ বিষন্ন হলে
নির্লিপ্ত এক জঙ্গলের রাজ্যে,
গাঢ় ঝড় হয়-
ডাল ভাঙ্গে, গাছ-ও;
পক্ষীশাবকের আদর আশ্রয় সব-ই তছনছ করে..
তারপর নদীপ্রোতে ঝাঁপ দেয় অবসন্ন;

সবুজে লেখা স্বপ্ন ক্রমে লাল আর কালো হয়ে-
অবুঝ অভিমানে অলীক পক্ষীরাজ হয়।



মোনালিসা

সুজয় দত্ত

চোখের তারায় হাল্কা ঝিলিক
ঠোঁটের পাতায় গহীন তৃষা
এত দেখেও পাইনা বুঝে --
হাসছ তুমি মোনালিসা?

সময় ছিল অন্যরকম
মেঘের মত মিলিয়ে যাওয়া
তুমি ছিলে মরশুমী ফুল
আমি ছিলাম পাগল হাওয়া

হাওয়ায় ভাসা গন্ধ পরাগ
টুকরো রঙিন ইচ্ছে-ঘুড়ি --
প্রজাপতির স্বপ্ন-ডানায়
আলোয় আলোয় ওড়াউড়ি

ওড়ার নেশায় খেই হারিয়ে
কখন কাছে কখন দূরে
হয়নি খেয়াল, হারিয়ে গেছি
এ পথ ঘুরে সে পথ ঘুরে

আমার পথে অনেক বাধা
দিন কেটেছে কাজের ভিড়ে
তোমার পথে অনেক পাওয়া
পাওনি সময় চাইতে ফিরে



সেই থেকে হায় তোমায় খোঁজা
আকাশপ্রদীপ জ্বালিয়ে প্রেমে
হঠাৎ পেলাম আজ বিকেলে
মিউজিয়ামে, ছবির ফ্রেমে

চোখের পাতায় হাল্কা শিশির
চোখের কোলে অমানিশা –
আজকে শুধুই বলছে যে মন
কাঁদছ তুমি মোনালিসা।



নিবারণের মা

তিতাস মাহমুদ

ছেলেবেলায় আমি খুব দুরন্ত ছিলাম। এই কথাটার কোন বিশেষত্ব নেই। শৈশবে সব ছেলেরাই দুরন্ত থাকে। তবে আমার দুরন্তপনার জন্যে অনেককেই অযথা অনেক কষ্ট পোহাতে হয়েছে, শুধু সে কথা ভেবে খুব কষ্ট হয় আমার। আমরা থাকতাম চট্টগ্রাম চন্দনপুরা কলেজ কলোনির ১৪৩ নং বাড়িতে। আমার বাবা চট্টগ্রাম কলেজের বাংলা বিভাগের অধ্যাপক ছিলেন। সেই সুবাদে সিনিয়র শিক্ষকদের জন্যে বরাদ্দ সরকারী কলোনির একটি তিন বেডরুম বাড়িতে আমার শৈশব কৈশোর কেটেছিল। সমবয়সী বন্ধু বান্ধবীতে ভরা ছিল কলোনির জীবন। আধবেলা স্কুল শেষ করে মার্বেল খেলা, দুপুর না গড়াতেই ছাদে ঘুড়ি ওড়ানো আর শেষ বিকেলে মেয়েদের সাথে 'ছি বুড়ি' খেলা! এই ছিল আমাদের দৈনিক রুটিন। একবার এক মেয়ের ফ্রকের ভেতরে 'বিছুটি পাতা' ঢুকিয়ে দিয়েই দৌড়ে পালিয়েছিলাম। সেই মেয়েটি আজ'তক আমার সাথে কথা বলে না। ক্রিকেট বলের আঘাতে কলোনির কত বাড়ির কাচের জানালা যে ভেঙ্গেছে তার কোন ইয়ত্তা নেই। একদিন পোস্টমাস্টার কাবু বাড়িতে বাড়িতে চিঠি বিলি না করে সোজা আমার বাবার কাছে চলে গেলেন; কারণ তার কাছে নিশ্চিত প্রমাণ ছিল সাইকেলের পিছনে বাঁধা সবগুলো চিঠির বিদেশি স্ট্যাম্প আমি চুরি করেছি। এমন কিছু যে একটা ঘটবে, আমি আগে থেকে টের পেয়েছিলাম। সে সময় আমাদের কোন দেয়াল ঘড়ি ছিল না। সবকিছুই চলতো মসজিদের মাইকে আযানের ধ্বনিতে। মাগরিবের আযান পেরিয়ে সেদিন আকাশ ঘন অন্ধকারে ঢেকে গিয়েছিল আমি মায়ের কড়া আদেশ অমান্য করে তখনো বাড়ির বাইরে ছিলাম। আমি জানতাম আজ সন্ধ্যায় বাড়ি গেলে আমার মৃত্যু হবে। আমি ভয়ে কাতর হয়ে কলোনির রাস্তার ওপারে পোড়ো মন্দিরে আশ্রয় নিয়েছিলাম। এমনিতে দিনের বেলাতেও আমরা ঐ মন্দিরে যেতে ভয় পেতাম; সেদিন আমার আর কোথাও যাবার জায়গা ছিল না। হঠাৎ দেখি প্রাত্যহিক পূজা শেষ করে এক প্যাঁচে সাদা পাতলা সুতির কাপড় পরা নিবারণের মা বেরিয়ে এলেন। তাঁকে দেখে আমি হাউ হাউ করে কেঁদে দিলাম। তিনি আমাকে যথাসম্ভব অভয় দিয়ে বাড়িতে নিয়ে এলেন। ডাকটিকিট সামান্য হতে পারে কিন্তু 'চুরি করা'র ব্যাপারটা বাবা কিছুতেই মেনে নিতে পারেননি। আমি এখন খুব বুঝি, সেদিন পোস্টমাস্টার কাবুর সামনে আমার বাবা খুবই অপমানিত বোধ করেছিলেন। নিবারণের মাকে জোর করে সরিয়ে দিয়ে বাবা আমাকে বেদম প্রহার করেছিলেন। খুব মনে আছে আমাকে চড় খাওয়ানোর হাত থেকে বাঁচাতে গিয়ে এই পঞ্চাশোর্ধ ভদ্রমহিলাও সেদিন আঘাত পেয়েছিলেন। আমার জন্মের পর থেকেই নিবারণের মা আমাদের সাথে আছেন। মহিলাদের যেমন প্রতিটি শাড়ির পেছনে একটি অ-বলা গল্প থাকে তেমনি আমার পিঠে অনেকগুলো ক্ষতের দাগ আছে; সে দাগের সবক'টি গল্প নিবারণের মায়ের জানা আছে।

ইদানিংকালের কথা বাদ দিলে আমি আমার মাকে মায়ের চাইতেও আমি বেশি পেয়েছি চশমা-পরা স্কুল টিচার হিসেবে। ঘুম থেকে উঠে তিনি স্কুলে ছুটতেন, আমরা দুই ভাইবোন থাকতাম নিবারণের মায়ের কাছে। বাবা সেই যে বের হতেন, আমরা জানতামই না রাতে তিনি কখন বাড়ি ফিরতেন। অবশ্য দুপুর গড়িয়ে বিকেলের শুরুতে আমাদের মা স্কুল শেষে ফিরে আসতেন। এভাবে যে যার সময়ে ফিরে আসতো কিন্তু নিবারণ আর কোনোদিন বাড়ি ফিরে আসেনি। আমরা কেউ জানতামনা সে কি পানিতে ডুবে না যক্ষ্মায় মারা গেছে। নিবারণের মাকেও কোনোদিন ছেলেকে নিয়ে কথা বলতে শুনিনি। তিনি বরাবরই নীরব এবং নিভৃত ছিলেন। আপন মনে আযানের শব্দ ধরে সংসারের মুখস্থ কাজ শেষ করে ঠিক এশার আগে একচালা ঘরে চলে যেতেন। পোড়ো মন্দিরের পিছনে ছিল তাঁর ঘরটি। দুপুরে ছাদে গিয়ে ভেজা কাঁথা, কম্বল, জামাকাপড়, তোয়ালে ইত্যাদি রোদে উল্টে পাশ্চটে দিতেন। গোসলের পর আমার মাথায় নারকেল তেল মেখে চুল আঁচড়ে দিতেন। তারপর কাঁসার বাসনে কৈ মাছের কাঁটা বেছে ভাতের সাথে ঝোল আর আলু ভর্তা মেখে ছোট ছোট 'ভাতবল' বানিয়ে দিতেন। আমার এখনো মনে আছে, ভাতবল গুলোর ভিন্ন ভিন্ন নাম ছিল। প্রথমটার নাম নীলকমল, পরেরটি নীল কমলের বড়দা লালকমল। তারপরেরটা প্রতিবেশী রাজ্যের রাজা; সে রাজার এক অপরাধী রাজকন্যা আছে। সবার শেষ ভাতবলটি অবধারিত ভাবে হতো সেই রাজকন্যার নামে। কোনোদিন মাধুরীলতা, কোনোদিন কাঞ্চনমালা। আর শেষ বলটা খাওয়া মানেই রাজকন্যার সাথে আমার বিয়ে হওয়া।

একবার বাড়িতে বাবার একজন ছাত্র আমার বয়েসী একটি ছেলেকে বেড়াতে নিয়ে এলেন। তখন বিকেল, আছরের আযান হয়েছে। বাবা আমাকে ডেকে নিয়ে বললেন, 'তিতাস, ওর নাম আবীর। ওর বাবা মা নেই। আজ থেকে তুমি আর আবীর, তোমরা বন্ধু হলো। যাও, ওকে নিয়ে গিয়ে মাঠে খেলাধুলো করে আসো।' আমি আবীরের হাত ধরলাম। আবীর একটু ইতস্তত করছিলো। আমি অবাক বিস্ময়ে আমার বাবাকে জিজ্ঞেস করলাম, 'ওর কী একটা নিবারণের মাও নাই?'

পাড়ার সবাই তাঁকে 'নিবারণের মা' বলেই ডাকতো। এতদিন পরে সত্যি আমি ভাবছি, অন্তত আমরা বাড়িতে ভাইবোন তাঁকে শ্রদ্ধা করে 'মাসি' বা 'দিদা', এমন কত নামেই তো ডাকতে পারতাম! কেন জানিনা, তা হয়নি। আসলে এমন যে তাঁকে আমাদের কখনো কোন নামে ডাকতে হয়নি। তাঁকে ডাকার প্রয়োজন হবার আগেই তিনি আমাদের কাছে এসে উপস্থিত হতেন। তবে মনে আছে, কলোনির অনেকে আমাদের অন্দর মহলে একজন হিন্দু মহিলার আসা যাওয়া, তার হাতের রান্নাবান্না সহজভাবে নিতে পারতেননা। আমি প্রায়ই মাকে বলতে শুনতাম, 'আমি হিন্দু মুসলমান

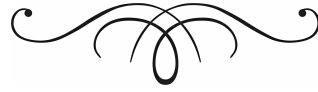
চিনিয়া, আমার ঘরে যারা আসেন, আমি বিশ্বাস করি তাঁরা প্রত্যেকেই ভাল মানুষ। এই নিবারণের মা ছাড়া আমার পক্ষে স্কুল কলেজের চাকরি করে তিয়াসা, তিতাসকে বড় করা কখনোই সম্ভব ছিলো না। নিবারণের মা ছিল বলেই পাঁচ ওয়াক্ত নামাজের ওয়ুর পানিটা সবসময় হাতের কাছে পেয়েছি।’

এরপর কখন যে কী হলো আমরা কিছুই জানলাম না। একদিন মায়ের কাছে শুনলাম, বাবার চাকুরিতে প্রমোশন হয়েছে। আমরা চট্টগ্রাম ছেড়ে ঢাকা চলে যাবো। সেটা ছিল ১৯৭৬ সাল। ফজরের আযানের পর থেকে আমাদের মালপত্র সব ট্রাকে তোলা শুরু হয়েছে। অবশ্য এর কিছুদিন আগে থেকে আমরা এ বাড়ি ও বাড়ি বিদায়ী ভোজ খেয়েছি। আমাদেরকে সাহায্য করার জন্যে কলোনির সবাই হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন। এসব বিদায় যজ্ঞেও নিবারণের মা ধীর স্থির, তাঁর কাজ করে যান। গোছগাছ সব চূড়ান্ত হয়েছে। আছরের আযান হলো। আমাদের দু’জনকে কাপে করে দুধ ঢেলে দিলেন নিবারণের মা। আমার জন্যে আলাদা করে দুধের সর তোলা থাকে সেখানে খানিকটা চিনি ছিটিয়ে দিলেন। চলে যাবার আগে সবাই আমাকে গাল টিপে টিপে আদর করছে। আমি ভীষণ উত্তেজনায় দুধ কিংবা সর কিছুই খেতে পারছিলাম না। আমি ঢাকায় যাচ্ছি, সেখানে আমার নতুন স্কুল হবে। শুনেছি ঢাকার স্কুল বাড়ি থেকে বেশ দূরে হয়, পায়ে হেঁটে যাওয়া যাবে না। আমি প্রতিদিন দু’বেলা রিকশা চড়তে পারবো, আমাদের ঢাকা বাসাতে একটা টেলিভিশন কেনা হবেএতো সবেের ভেতরে নিবারণের মায়ের কথা মনেই ছিলনা। তাছাড়া ওঁনাকে পরিবারের বাইরের কেউ ভাবার তখনো কোন কারণ ছিলো না আমার। ঠিক সেই মুহূর্তে মা এসে বললেন, ‘পায়ে হাত ছুঁইয়ে নিবারণের মায়ের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে নাও। মাগরিবের নামাজ পড়ে আমরা তোমাদের নানার বাড়ি যাবো।’ এটা আমি জানতাম যে আগামীকাল ভোরে ফজরের নামাজের পরেই আমাদেরকে ট্রেন স্টেশনে যেতে হবে।

সন্ধ্যা চলে পড়েছে। আমার শৈশবের চন্দনপুরা কলেজ কলোনি ছেড়ে চলে যাচ্ছি। রিক্সার পাদানিতে টুকটাক ছোট কয়েকটি ব্যাগ। বাবা রিক্সাচালককে একটু সাবধানে চালাতে বললেন। রিক্সাটা ধীরে ধীরে এগিয়ে যাচ্ছে। রাস্তার এপাশ বাড়ির সামনের পোড়ো মন্দিরটাকে ঘন কালো দেখাচ্ছে। আমার মনে পড়লো সেই ভয়াবহ রাতের কথা, যে রাতে এই মন্দির ছাড়া আমার আর কোথাও আশ্রয় ছিল না। আমাদের রিক্সা ডানে মোড় নেবার আগে আমি শেষবারের মতো মন্দিরের ভিতরটা দেখার চেষ্টা করলাম। সেখানে একটি মৃদু প্রদীপের আলো ছাড়া আর কিছুই দেখা গেল না।

এইতো আমি। আমার ডানপাশে দিনে পাঁচবার আযানের ধ্বনি অন্যপাশে পূজার প্রদীপ হাতে সার্বক্ষনিকের জন্যে নিবারণের মা। কী আমার শৈশব! কী আমার কৈশোর! আমি বেড়ে উঠেছি দু’পাশের এই দুই অপূর্ব বৈভব আর বিত্তের ভিতর দিয়ে। বড় হয়ে আমি আর নতুন কোন ধর্মজ্ঞান অর্জন করিনি। আমি ধর্মযাজক নই সত্য, তবে আমি অন্ধ নই।

অক্টোবর ৪, ২০১৮



বারোয়ারি বলতে বোঝায় বাঙালি হিন্দুদের সর্বজনীন পূজা বা উৎসব। শব্দটি মূলত পশ্চিমবঙ্গে প্রচলিত। "বারোয়ারি" শব্দটির উৎপত্তি "বারো" (১২) ও "ইয়ার" (বন্ধু) শব্দদুটি থেকে। ১৭৯০ সালে হুগলির গুপ্তিপাড়ায় বারো জন ব্রাহ্মণ বন্ধু একটি সর্বজনীন পূজা করবেন বলে মনস্থ করেন। প্রতিবেশীদের থেকে চাঁদা তুলে আয়োজিত হয় সেই পূজা। এইভাবেই বাংলায় যে সর্বজনীন পূজানুষ্ঠানের সূচনা হয় তা লোকমুখে "বারোয়ারি পূজা" নামে জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। প্রথম দিকে, দুর্গাপূজা কেবল কলকাতার ধনী বাবুদের গৃহেই আয়োজিত হত। কিন্তু বারোয়ারি পূজা চালু হওয়ার পর ব্যক্তি উদ্যোগে পূজার সংখ্যা হ্রাস পায় এবং দুর্গাপূজা একটি গণ-উৎসবে পরিণত হয়।



বিজয়ার প্রীতি

ও

শেখু আনাই।



Amit, Tanya, Rishav & Rhine

2018



শারদীয় অভিনন্দন



সুজিত, বৈশাখী, সুরঞ্জিত, সঞ্জনা



PURE 
ELEGANCE

1655 Oak Tree Road, Edison, NJ 08820

☎ 1-800-787-3353

অঙ্কন

অনাভি বিশ্বাস (৯ বছর)



তানভী মালংকার (৯ বছর)



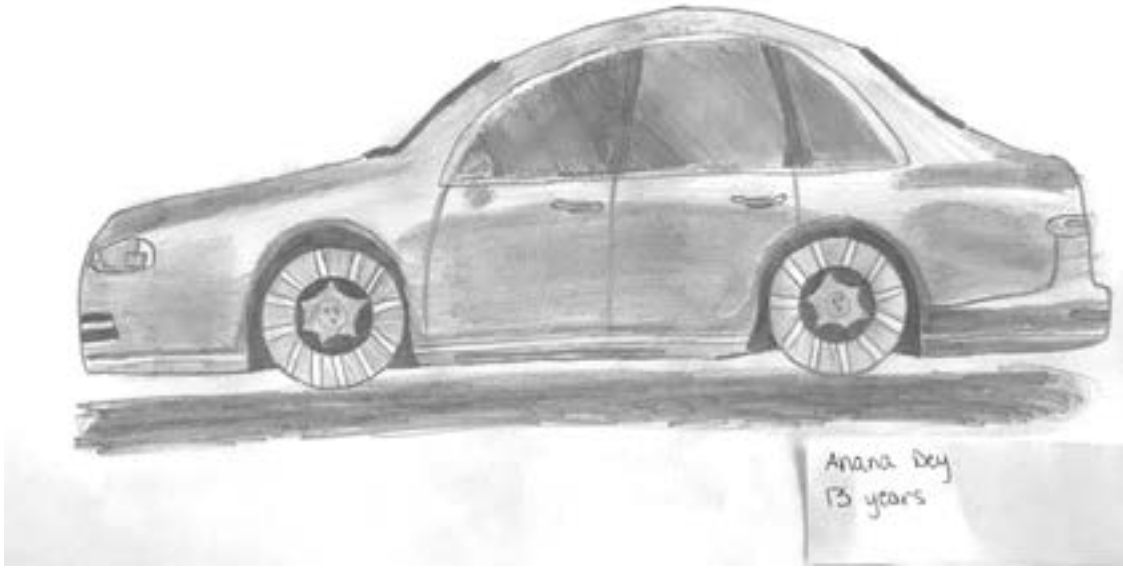
অনহিতা চৌধুরী (৬ বছর)



আর্যব মুখার্জী (৬ বছর)



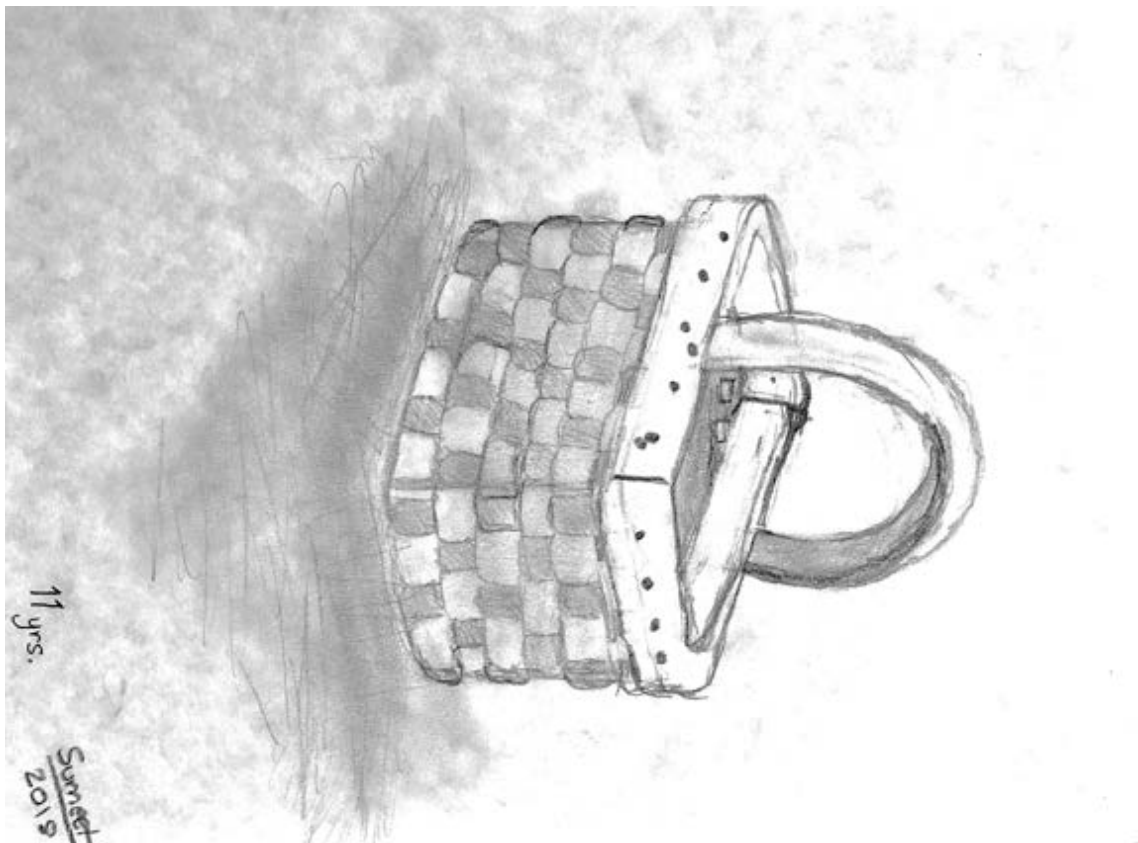
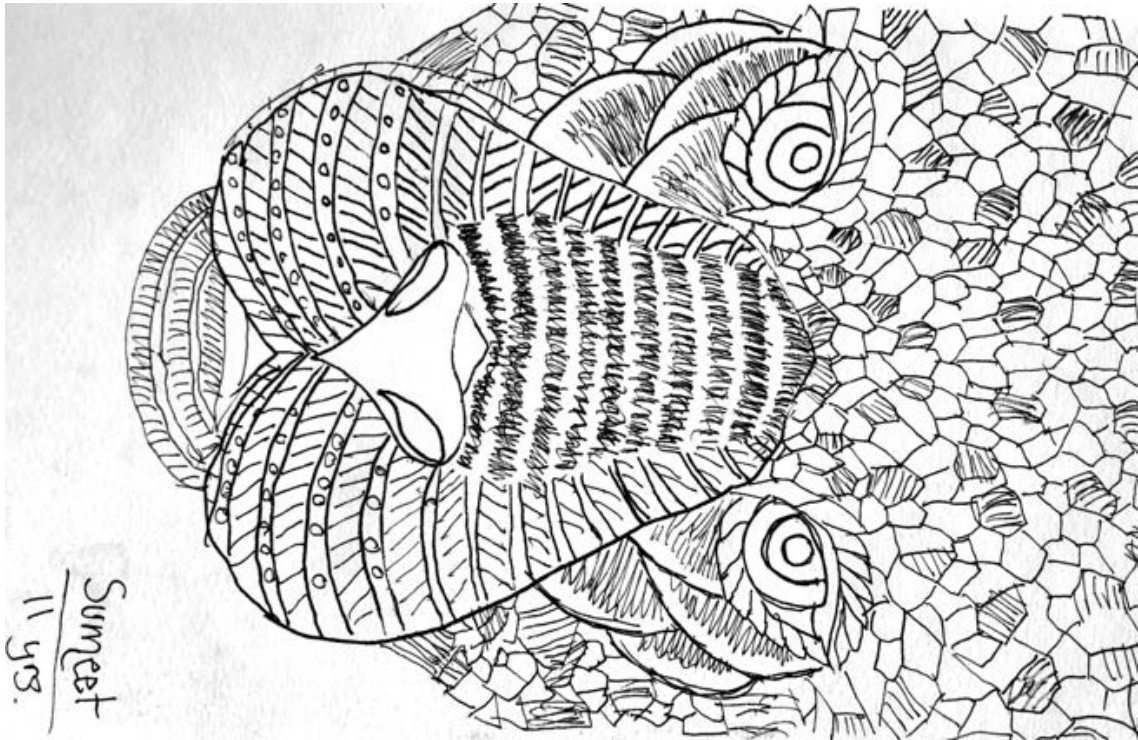
অহনা দে (১৩ বছর)



অনুষ্কা দে (১৩ বছর)



সুমিত চক্রবর্তী (১১ বছর)



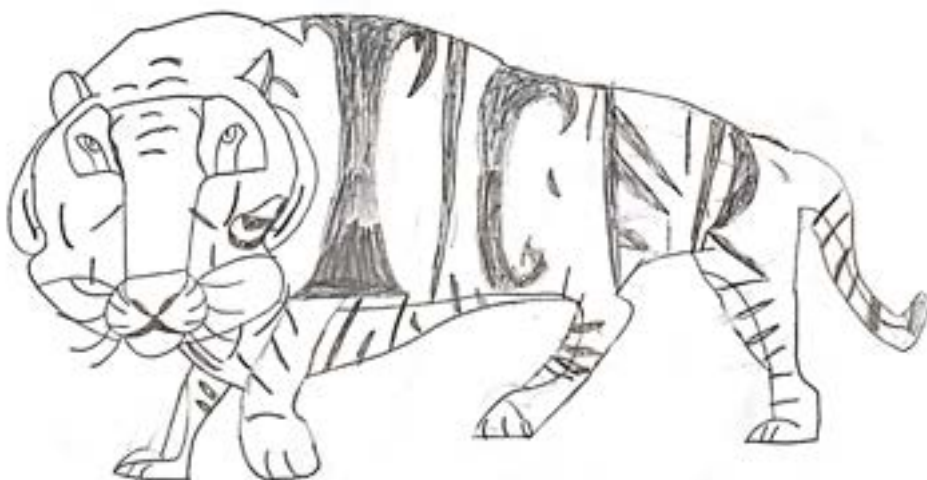
আঁখি তালুকদার (১৩ বছর)



শৌর্য ভট্টাচার্য (৮ বছর)



মা দুর্গা,
৮৫ শৌর্য (করাণ)



Saurya, age 8 (Korina):
A Tiger Inside Of A Tiger

অলিভিয়া নাথ (১১ বছর)



সারা কুমার (১২ বছর)



আর্যভ দাস (১০ বছর)



আরিয়ান ঘোষ (১০ বছর)



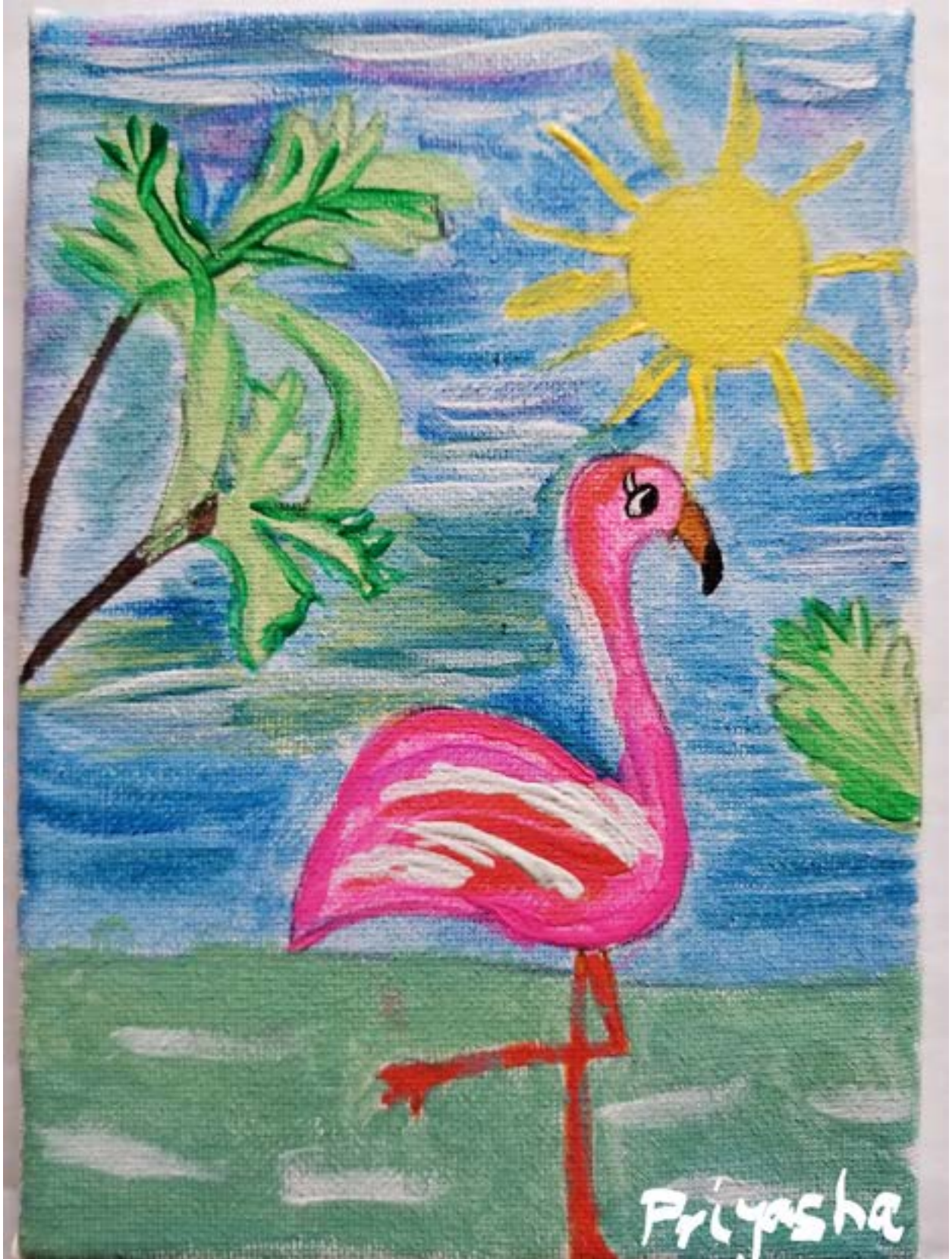
রোহন ঘোষ (৭ বছর)



ইন্দ্রাণী দাস শর্মা (১০ বছর)



প্রিয়াশা ঘোষাল (৭ বছর)







ফোন

পল্লব ভট্টাচার্য্য

মিটিং চলছিল তখন। মোবাইল ফোনটা বেজে উঠেছিল। ঠিক বেজে উঠেছিল বললে ভুল বলা হবে, কারণ ফোনটা সাইলেন্ট মোডে ছিল। চঞ্চলের নম্বর ভেসে উঠেছিল। কিন্তু ফোনটা ধরেনি কালিপদ। “Can I call you later?” মেসেজ পাঠিয়ে দিয়েছিল। আবার ফোন এসেছিল চঞ্চলের কাছ থেকে এক মিনিটের মধ্যে। আবার ফোন ধরেনি কালিপদ। চঞ্চল এখন ninth grade-এ পড়ে। একটু তো বোঝা উচিত বাবার কাজ থাকতে পারে অফিসে। ছেলেটা এখনও সেই বাচ্চাই থেকে গেল। যখন তখন রাগ, যখন তখন অভিমান। কালিপদের সেটা অবশ্য ভালই লাগত। যতদিন বাচ্চা থাকে তত ভাল। কলেজে চলে গেলে তো আর তেমন দেখা হবে না। বাড়ি ফিরে চঞ্চলকে playstation-এর নতুন গেম কিনে দেওয়ার কথা কালিপদের। সেইজন্যই হয়ত চঞ্চল ফোন করে থাকবে। মিটিং শেষ হলে ফোন করবে ঠিক করেছিল কালিপদ। কিন্তু সেই ফোন আর করা হল না। সেই ফোন আর করা হবেও না।

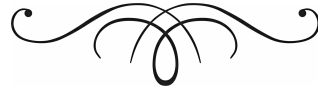
কালিপদ ঠিক বুঝত না চঞ্চলের কি ভাল লাগে। এক বছর শিখে আর violin শিখল না। দাবা শিখল মাত্র ছয় মাস, নয় মাস ক্যারাটে, কোন কিছুতেই কালিপদ ছেলের মন বসতে দেখত না। স্কুলের কোন ক্লাবেও চঞ্চল যোগ দিতে চায় নি। শেষ পর্যন্ত science teacher মিস্টার গ্রাহামের সঙ্গে বেশ কয়েকবার দেখা করে কালিপদ। অবশেষে science Olympiad-এ যোগ দেয় চঞ্চল। সেই সূত্রেই পরের সপ্তাহে কলম্বাসে একটা প্রতিযোগিতায় যাওয়ার কথা চঞ্চলের। অলকা আর কালিপদেরও যাওয়ার কথা। অলকা আর কালিপদ ঠিক করে চঞ্চলকে কিছু কিনে দেবে। সে কারণেই ঐ playstation-এর FIFA 18 কিনে দেওয়ার কথা সেদিন।

মিটিং চলাকালীন অলকার ফোনও এসেছিল। ধরেনি কালিপদ। “Can I call you later?” মেসেজ পাঠিয়ে দিয়েছিল। অলকা যখন তখন ফোন করে না। তবু ফোন ধরেনি কালিপদ। খুব গুরুত্বপূর্ণ মিটিং যে!

অনেক খুঁজে কালিপদ আর অলকা বাড়ি কেনে এই শহরে। এখানকার স্কুল যে খুব ভাল। সব ভাল পরিবারের ছেলেমেয়েরা পড়ে এই স্কুলে। এদের SAT স্কোর খুবই ভাল। আর নিরাপদ এলাকা। স্কুলে বাচ্চা পাঠিয়ে কোন দুশ্চিন্তা নেই।

মিটিং-এর পরে বাথরুমে যেতে যেতে ব্রেক রুমের tv-টার দিকে চোখ চলে যায় কালিপদের। “An unidentified gunman...” ফোনটা নিয়ে পাগলের মত ছোট্ট কালিপদ। সেখানে message দেখাচ্ছে “মা, বাবা, I think I am going to die, can you save me? মা, বাবা, Love you”.

আজ এক বছর হয়ে গেল। NRA, gun control group আজও মাঝে মাঝে বক্তৃতা দেয়। Playstation-এর FIFA 19 আজ বাজারে বেরোবে। Science Olympiad-এ স্কুল খুব ভাল করছে। কিন্তু চঞ্চলকে আজও ফোন করেনি কালিপদ।





মহিষাসুর

শুভ ব্যানার্জী

আমার
ছেলে
বেলা

একদিন মহিষাসুর
দেখল সকাল সকাল
গনেশ দাদা কোথায়
যাচ্ছে..



গনু দাদা
তুমি কোথায়
যাচ্ছেছো?



স্কুলে
...এ..



আমিও
যাব

মহিষাসুর
আবার স্কুলে
যায় নাকি...





দুর্গা পূজোর মহালগ্ন

লেখা: সুনন্দা রায়; ছবি: নন্দিনী দেব ও শমীক রায়

আর কদিন পরেই দুর্গা পূজোর মহালগ্ন। বাঙালির প্রাণের পূজো, মিলনের উৎসব। দুর্গা পূজোর সময় প্রথমেই যে কথা মনে আসে তা হল মাটির টান। এই টান অনুভব করে তারাই, যারা অনেকদিন দেশের বাইরে আছে।

শরৎকালের আকাশ বাতাস বেশী করে মনে করিয়ে দেয় যে পূজো আসছে। এই কটা দিন সবার মনে উৎসাহ উদ্দীপনায় এক নতুন প্রাণের সঞ্চার হয়।

দুর্গা পূজো মানেই বাঙালির এক চিরন্তন উৎসব। দুর্গা পূজো মানে কাশফুল আর শিউলির গন্ধ। দুর্গা পূজো মানেই ভাল খাওয়া দাওয়া আর বাচ্চাদের হাসি আর আনন্দে ভরা মুখগুলো।

আমরা যেই দেশেই থাকেছি, দুর্গা পূজোর টান অনুভব করেছি। মন্ট্রিয়াল, টরন্টো, লন্ডন- সব শহরে যে ছোট বা বড় দুর্গা পূজো হয়, বন্ধুদের সঙ্গে আমরা সেই সব পূজোর আনন্দ উপভোগ করেছি। কলকাতার পূজো প্যাভেল মানে তো আর্ট ইনস্টলেশন!

তারই কিছু ছবি আপনাদের সঙ্গে শেয়ার করছি।

London Ealing Town Hall Pujo 2009



London Camden Pujo 2009



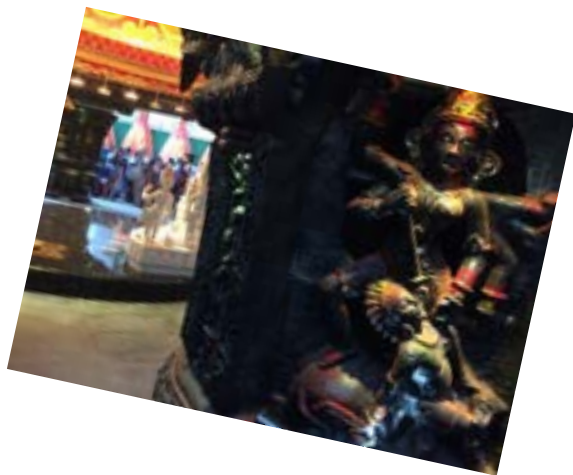
Montreal'er Bengali Association 2005

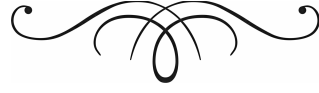


Toronto Kaali Baari 2012



এবার কিছু কলকাতার প্যাভেলনের ছবি:





ক্লীভল্যান্ডের প্রথম দুর্গাপ্রতিমা

ক্লীভল্যান্ড-এ দুর্গাপূজা প্রথম সম্পন্ন হয় ১৯৭৮ সালে। মূর্তি আনা হয়েছিল কলকাতা থেকে। সেই সময় এই শহরে বাঙালির সংখ্যা ছিল নগন্য। অ্যাক্রন ও অন্যান্য আশেপাশের শহর মিলিয়ে কুড়ি পাঁচশটি পরিবার। কিন্তু সেই পূজোয় সমাগম হয়েছিল প্রায় সাড়ে তিনশো মানুষের, যাদের অনেকেই এসেছিলেন ডেট্রয়েট, পিটসবার্গ ইত্যাদি শহর থেকে, কারণ ওই সমস্ত শহরে তখন পূজা শুরু হয় নি। এর পর কিন্তু দুর্গা প্রতিমা তৈরী হয় এই ক্লীভল্যান্ড-এই, নির্মাণ করেন ভারতী চৌধুরী এবং অশোক চৌধুরী। সেই মূর্তিই বহুদিন পূজা হয়ে এসেছে। প্রসঙ্গতঃ এই বছর, ২০১৮ সালে, নতুন দুর্গা প্রতিমা আসছে পূজোয়, আনা হচ্ছে কলকাতার কুমারটুলি থেকে।

Best Wishes and Puja Greetings



From a well wisher

পূজো সবার খুব ভালো কাটুক। সবাইকে জানাই
শারদীয়ের আন্তরিক প্রীতি ও শুভেচ্ছা।



- শুভানুধ্যায়ী